গ্রীক পুরাণের গল্প

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
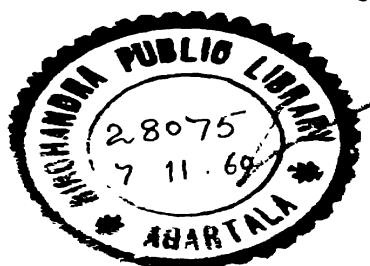
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৬৬
জুন, ১৯৫৯
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২
ছেপেছেন
দেবেশ দত্ত বি, কম্
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২, জগবন্ধু মোদক রোড
কলকাতা-৫
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
চারু খাঁ
চার টাকা

পিতৃদেবকে

গ্রীক দার্শনিক জেনোফেনিস একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, গাধারা যদি দেবতার ধ্যান করতে পারত তাহলে গাধার মতো চেহারা হোতো দেবতাদের। কথাটা শুধু চমকপ্রদ নয়, গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে এই কথার মধ্যে। এ কথা আজকের নয়, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর। প্রাচীন গ্রীসে পুরাণ ও পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রতি চিন্তাশীল দার্শনিকদের সংশয় ও অনাস্থা তখনই জোরালো হয়ে উঠেছে। কবি ও নাট্যকারদের অমর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস এক প্রাগ্রসর বিবর্তনের পথে যাত্রা শুরু করেছে, মানবমনে গুঞ্জরিত হচ্ছে মানুষের জয়গান। মানব-ইতিহাসের সেই প্রাচীন যুগে গ্রীক দার্শনিক আশ্চর্য বলিষ্ঠতার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে দেবতা মানুষ সৃষ্টি করে নি, মানুষই দেবতাকে সৃষ্টি করেছে,—তাই দেবদেবীর মনুষ্য-রূপ।

গ্রীক পৌরাণিক যুগ আরো বহু শতাব্দী পূর্বেকার। গ্রীক পুরাণ কবে প্রথম কল্পিত বা রচিত হয়েছিল তা কেউ জানে না। 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি'র রচয়িতা হোমারকে গ্রীক পুরাণের জনক বলা হয়। হোমার তাঁর মহাকাব্য রচনা করেন খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে। যে ট্রয়যুদ্ধ তাঁর রচনার উপজীব্য সেই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। অলিম্পাসের দেবদেবীকে হোমার তাঁর মহাকাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই দেবদেবীর কল্পনা ও গ্রীক পুরাণের সূচনার আরম্ভ কবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা যায়না।

পুরাণের আরম্ভ কবে? মানব-সভ্যতার প্রভাতী যুগকে কল্পনা করি। সে যুগে এই বিরাট ও প্রচণ্ড বিশ্বপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ কতো দুর্বল, কতো নিরুপায়! নির্বোধ সে নিরস্ত্র সে,—প্রকৃতির খেয়াল খুশির হাতে ক্রীড়নক মাত্র সে। অশেষ তার বিস্ময়,—অসীম তার আতঙ্ক। বজ্র রূপে প্রকৃতি তাকে দগ্ধ করে, ঝঞ্ঝা রূপে তাকে ধ্বংস করে, বন্যা রূপে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার আশ্রয়। প্রকৃতি করুণাও করে শস্য রূপে তৃপ্তি রূপে,—কিন্তু সেও তো তার খেয়াল। কখন সে মিত্র, কখন সে শত্রু,—কখন সে হাসে, কখন বা সে কাঁদায়।

আদিম মানুষ প্রকৃতিকে ভয় পেয়েছে,—প্রকৃতিকে আপন সত্তার সঙ্গে একীভূত করতে পারেনি। সে বুঝতে পারেনি যে এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সেও অংশ,—এই প্রকৃতির বাইরে সে নয়। আদিম মানুষ ভেবেছে সে একলা,—আর তাকে ঘিরে আছে কৃষ্ণ আতঙ্ক আর ছায়া-ছায়া জাদু।

এই আতঙ্কিত জাদুরাজ্যের অন্ধকারে কবে গ্রীক মন প্রথম জেগে উঠেছিল, আশার নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল তার চোখ, তা কেউ জানে না। সেদিন গ্রীক মন সহসা বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-সত্তার মধ্যে এক আশ্চর্য যোগসূত্রকে কল্পনা করে নিয়েছিল। প্রকৃতির কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে ছিল মানুষ,—এক মুহূর্তে মানুষ হয়েছিল এক নূতন আত্মোপলব্ধির অধিকারী।

প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে সুপ্রাচীন গ্রীকরা দেবত্বে ভূষিত করেছিল। প্রকৃতির শক্তি মানুষের চেয়ে অধিক, অতএব দেবতারা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। প্রকৃতির রূপ মানুষের চেয়ে মহত্তর, সুতরাং দেবতারা মানুষের চেয়ে সুন্দরতর। কিন্তু এই সৌন্দর্যকে অর্জন করাই মানুষের সাধনা, এই শক্তিকে জয় করাই মানুষের উত্তরাধিকার। তাই গ্রীক মনের কল্পিত দেবদেবীর অপরূপ মনুষ্যকান্তি। এই অপরিসীম সৃষ্টিলীলা থেকে মানব-ভাগ্য বিচ্ছিন্ন নয়। তাই গ্রীক পুরাণে দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি নিকট, অতি প্রত্যক্ষ। প্রাচীন মিশর বা মেসোপটেমিয়ার দেবমূর্তি মানুষের সুন্দর ও স্বাভাবিক প্রতিকৃতি নয়—অবাস্তব জান্তব দানবের ভয়াল মূর্তিই সেখানে প্রধান। কিন্তু গ্রীক দেবদেবী নরনারীর শ্রেষ্ঠ দেহসৌন্দর্যের ও শক্তির প্রতিচ্ছবি। সমর্থ সৌন্দর্যের এই অনুপম কল্পনা ও ধ্যানের মধ্য দিয়েই প্রাচীন গ্রীক জাতি সৃষ্টির বিচিত্র রহস্যকে উপলব্ধি করবার ও আয়ত্ত করবার প্রথম প্রয়াস করেছে। দেবতা যেখানে মনুষ্যরূপী, সেখান থেকেই মানুষের দেবত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষার শুরু।

পৌরাণিক গ্রীসের দেবদেবী যেমন প্রকৃতির বিচিত্র রূপের প্রতিরূপ, তেমনি মানবমনের বিভিন্ন সহজাত বৃত্তিরও মূর্ত প্রকাশ। প্রকৃতি অসীম,—তেমনি আর-এক অসীম মানুষের আপন মন। মানবমন যেন এক অনন্ত সাগর। এই সাগরে অনির্বাণ তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে বৃত্তি-নিচয়ের আলোড়ন। মানবমনের নানা বিচিত্র উদ্বেলন প্রকৃতিরই মতো অবোধ্য ও অপ্রতিরোধ্য। মনের মধ্যেই বৃত্তিদের বাসা,—অথচ মন তাদের বেঁধে রাখতে

পারে না। বাসনা কামনা প্রেম স্নেহ ক্রোধ লোভ দম্ভ, বিভিন্ন সুকুমার বৃত্তি,—এরা মানুষকে বড়ো করে ছোট করে, আকাশে তোলে আবার নিক্ষেপ করে দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে। এরা এতো নিকট, অথচ এতো রহস্যময়। প্রাচীন গ্রীক তার অন্তরের প্রধান বৃত্তিগুলিকে পৃথক পৃথক করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছে এবং এদের মূলে এক-এক জন প্রত্যক্ষ মনুষ্যরূপী দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। অবচেতনের অবয়বহীন আতঙ্ককে তারা রূপের বন্ধনে বেঁধেছে, বাহিরের ও ভিতরের উভয় অসীমকেই সীমিত সৌন্দর্যের ভূষণ পরিয়ে আপন করে নিতে চেষ্টা করেছে।

পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাচীন জাতি বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নিকটতর রূপে কল্পনা করেছেন, সেই সমস্ত জাতিই সমৃদ্ধ পুরাণের অধিকারী। দেবদেবীকে মানুষের সংসারে প্রতিষ্ঠিত না করলে পুরাণ হয় না,—যে সম্পর্ক শুধু বশ্যতার আর আতঙ্কের সে সম্পর্ক দিয়ে রচিত হয় না কল্পকাহিনী। দেবতাকে মনুষ্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের সুখদুঃখ কামনা কল্পনার সহযোগী করতে হয়,—তবেই দেবমানবের পুরাণ-কাহিনী সৃষ্টি হয়। পৌরাণিক গ্রীস নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তারূপে কোনো অপ্রত্যক্ষ নিরাকার সর্বশক্তিমান একেশ্বরের কল্পনা করেনি—যে একেশ্বর মানব-ইন্দ্রিয়ের অগোচর, মানব সম্পর্ক সম্বন্ধে উদাসীন, মানুষের ভয়ার্ত উপাসনা যার অরূপ অস্তিত্বকে স্পর্শ করে না। প্রকৃতির হাসিকান্না ও অন্তরের আনন্দবেদনাকে পৌরাণিক গ্রীস দেবদেবী রূপে কল্পনা করেছে এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপচারে এই দেবদেবীকে সংসার সীমানার মধ্যে আসীন করেছে। কল্পনা করেছে যে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা রুচি-প্রবৃত্তি সমভাবে এই দেবদেবীর মধ্যেও আছে। প্রকৃতির রহস্য যতো সহজ হয়েছে, সমাজের সুস্থ বন্ধনে মনের আদিম বৃত্তিগুলি যতো সুসংযত হয়েছে এই দেবদেবীর সঙ্গে ভক্ত-সম্পর্কও ততো সাবলীল হয়েছে। এবং ধীরে ধীরে শেষ পর্যন্ত গ্রীক মানস প্রয়াস করেছে বাস্তবিক মানব-চরিত্রকে কাল্পনিক দেবচরিত্র থেকে উন্নততর করবার।

এইখানেই গ্রীক পুরাণের মহত্ত্ব। গ্রীক পুরাণ দেবতাকে বড়ো করেছে, কিন্তু মানুষকে ছোট করেনি। গ্রীক পুরাণ অলিম্পাসের অধীশ্বরকে কল্পনা করেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে সেই মর্তমানবকে কল্পনা করেছে দেবদুর্লভ যার চরিত্র-মহিমা। ঘোষণা করেছে মানবের জয়গান।

এইখানেই গ্রীক পুরাণের চলিষ্ণুতা। পরবর্তীকালে প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক যুগের সাহিত্যিক দার্শনিক ও শিল্পীরা পুরাণকে বর্জন করবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি, বরং পৌরাণিক কাহিনীকে তাঁদের সৃষ্টির ও সাধনার প্রধান উপজীব্য করেই মানবতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। গ্রীক পুরাণের মানবতাবাদের মধ্যেই নিহিত ছিল সেই স্ফুলিঙ্গ, যার অগ্নিস্পর্শে প্রাচীন গ্রীসে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। গ্রীক পুরাণের অনুধ্যান বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই তার সঙ্গে বাস্তব বিজ্ঞানের যোগসূত্র সন্ধান করা শক্ত নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও এই একই কারণে গ্রীক পুরাণের কাছে ঋণী।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রাচীন গ্রীস রোমান শক্তির কাছে পর্যুদস্ত হয় ও রোম সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। রোম তার শক্তি দিয়ে গ্রীসকে জয় করে, কিন্তু গ্রীস রোমকে জয় করে তার সংস্কৃতি দিয়ে। রোমক পণ্ডিতরা গ্রীক পুরাণ অধ্যয়ন করেন ও নূতন করে কাহিনীগুচ্ছ লিপিবদ্ধ করেন। গ্রীসের পৌরাণিক ধর্ম ও শিল্প রোমক মনকে অক্লেশে জয় করে নেয়। ক্রমে রোমের দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রে যখন মানবতা ও স্বাধীনতা পিষ্ট হতে থাকে তখন গ্রীক পুরাণের প্রতি আকর্ষণও অবসিত হয়। খ্রীষ্টধর্মের বীর্যহীন আত্মবিসর্জনের মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মানবতার অপমানে গ্রীক পুরাণ বিস্মৃতির অতলে মুখ লুকায়। ইউরোপের অন্ধকার মধ্যযুগের অবসানে রেনেসাঁসের যুগে আত্মবিস্মৃত মানুষ যখন আবার মাথা তোলে তখন সে এই প্রাচীন পুরাণকে আবার খুঁজে খুঁজে বার করে। উনবিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক চেতনা যেসব মহান কবি ও শিল্পীকে গণতন্ত্র ও মানবতার জয়গানে উদ্বুদ্ধ করে, তাঁরা এই পুরাণের মধ্যে তাঁদের প্রাণের ভাষা খুঁজে পান।

আজ মানুষ প্রকৃতির গোপনতম রহস্যকে উদ্ঘাটন করতে চলেছে, অভিযান শুরু করেছে অন্তরীক্ষের দুর্নিরীক্ষ তারায় তারায়। জুপিটারের বজ্রকে সে অর্জন করেছে হাতের মুঠোয়,—জয় করতে চলেছে দেবদুর্লভ অমরত্বের অধিকার। মানব-ভাগ্যের এই অপরিসীম সম্ভাবনার ইঙ্গিত গ্রীক পুরাণের মধ্যে। এইখানেই গ্রীক পুরাণের অমরত্ব।

গ্রীক পুরাণে অসংখ্য কাহিনী, চরিত্র-সংখ্যা অসংখ্যতর। এই সমস্ত কাহিনী ও চরিত্রের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশকেও বাংলা ভাষায় রচিত একটি সুলভ গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। আদিম সৃষ্টিকল্পনা, দেবদেবীগণের পরিচয় ও কয়েকজন বিখ্যাত পৌরাণিক মর্তমানবের কথা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হোলো। প্রতীচ্য পুরাণের ভূমিকা রূপে এই গ্রন্থকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দেবদেবী

এক

প্রতীচ্য সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীস দেশ। এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের আলোয় পশ্চিম জগতের যুগযুগান্তের অন্ধকার কেটে যায়, মানব-সংস্কৃতি সেই আলোকের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মানব-সভ্যতার বিবর্তনের মধ্যে আশ্চর্য একটা চমক আছে। কোনো-কোনো জাতির ইতিহাস যেন মশালের মতো জ্বলে ওঠে, কিম্বা হাউইয়ের মতো আকাশে উঠে যায়। চারদিক আলোয় আলো হয়ে ওঠে, গুহা-কন্দরের মধ্যেও স্ফুলিঙ্গগুলো ছড়িয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ঐ হাউই হচ্ছে মানব-মন। তার যাত্রার পিছনে অজানাকে জয় করবার বিপুল আগ্রহ, তার আলো অজ্ঞতার অপনোদন। এমনি ইতিহাস গ্রীক জাতির।

পশ্চিম পৃথিবীতে প্রথম মহাকাব্য রচনা করেছিলেন হোমার—গ্রীসের অধিবাসী। প্রথম ঐতিহাসিক গ্রীক হেরোডোটাস, প্রথম চিকিৎসা-বিজ্ঞানী গ্রীক হিপোক্রেটিস। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্ম গ্রীস দেশে। পশ্চিমের কাব্য সাহিত্য ও শিল্পকলার মাতৃভূমি গ্রীস। এই গ্রীসেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছিল, এই দেশেই সূচিত হয়েছিল চিন্তার মুক্তি।

গ্রীস দেশের ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদের যেখানে শুরু, তারও আগেকার কথা। প্রকৃতির ক্রোড়ে বীর্যবান পুরুষ আর সুন্দরী নারীদের বাস। পাহাড় আর নদী, বৃক্ষলতা আর তৃণভূমি তাদের

জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঋতুর পরিবর্তন। প্রকৃতিকে তারা যেমন ভালোবাসে, তেমনি প্রকৃতি বিস্ময়ও জাগায় তাদের মনে। অগণ্য গ্রহতারা-খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে তারা, তাকিয়ে থাকে সুবিপুল সমুদ্রের দিকে। যার কোনো সীমানা নেই, যে চক্রবালে কখনো গিয়ে কেউ পৌঁছতে পারে না, যার কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ কেউ জানে না,—সেই অনাদ্যন্ত অসীমের দিকে দৃষ্টি রেখে ওরা আশ্চর্য হয়ে যায়। কোথা থেকে জন্ম নিল এই অসীমতা, যার মাঝখানে এই মাটির পৃথিবী? অনন্ত অন্তরীক্ষের মাঝখানে যেন ভাসমান একটি দ্বীপ, যে দ্বীপে পদে পদে প্রকৃতির বিস্ময়, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির নব নব দান,—যে দ্বীপকে ঘিরে আছে ঐ অনন্ত আকাশ আর অপার সমুদ্র!

সূচীভেদ্য অন্ধকার, সমস্ত চরাচর সেই অন্ধকারে নিষুপ্ত। অন্ধকার পশু-পক্ষীর চোখে, অরণ্য-পুষ্পগুলিও চোখ মুদে আছে সেই অন্ধকারে। হঠাৎ কোথায় যেন কোন্ অতন্দ্র প্রাণে বাজল মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি। সমস্ত পৃথিবী জাগল এক আশ্চর্য মুহূর্তে,—প্রকৃতিতে জাগল পুলকের সাড়া। পূর্ব দিগন্তে সোনালি আবির, জ্যোতির্ময় সবিতার আবির্ভাব। নিষ্প্রাণ পেল প্রাণ, অন্ধ পেল দৃষ্টি। আকাশের ঐ তিমির-বিদার জ্যোতিষ্ক,—কে সে? সে কি কোনো দেবতা? পূর্ণিমা-রাতের পূর্ণচন্দ্র-বিভা, কোন্ দেবীর মধুর হাসি এ? আবার যখন দিগন্ত জুড়ে কালো মেঘ আর গুরু-গুরু গম্ভীর গর্জন,—তা অন্তরীক্ষের কোন্ বজ্রপাণির হুহুঙ্কার? কার ভ্রূকুটি-ইঙ্গিতে সমুদ্র ফুঁসে ফুঁসে ওঠে,—ভাসিয়ে নিয়ে যায় গ্রাম নগর জনপদ, ডুবে যায় বাণিজ্য-তরণী? কোন্ করুণাময়ীর স্নেহস্পর্শে শস্যশ্যামলা হয় ধরিত্রী, ভরে ওঠে হেমন্তের সোনালি ফসলে? আবার শীতের শুষ্ক মর্মরে কোন্ অদেখা অমানবীর দীর্ঘশ্বাস! বসন্ত রাত্রে

অরণ্যের পুষ্পকুঞ্জে আর স্রোতস্বিনীর কুলু-কুলু গানে যে মায়া জাগে, সেই মায়া আনে অজানা অপ্সরীরা,—তাই না? কে দিয়েছে শিশুর মুখে হাসি, মায়ের স্তন্যে দুগ্ধ, দম্পতির অন্তরে প্রেম? পাখির কণ্ঠে কে দিল সুর, মানুষের কণ্ঠে কে দিল ভাষা? কে শোনালো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজমন্ত্র? কে হানে মৃত্যু? কে আনে নবজীবনের আশীর্বাদ?

বিশ্বপ্রকৃতির বিস্ময়ের দিকে অবাক হৃদয়ে তাকিয়ে থাকে আর কল্পনা করে প্রাচীন গ্রীসের উন্মুখ নরনারী। পৃথিবীর সমস্ত দেশের আদিম মানুষ এমনি বিপুল বিস্ময়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছে। অধিকাংশই ভয় পেয়েছে, যা কিছু জানা-চেনার বাইরে তার মুখোমুখি হয়ে ঠকঠক করে কেঁপেছে। আবার অনেক মানুষ এক অতীন্দ্রিয় দর্শন সৃষ্টি করেছে, বিশ্বলীলার বিচিত্র রূপকে এক অনির্বচনীয় অরূপের সঙ্গে বিলীন করার ভাবগাম্ভীর্য গড়ে তুলেছে নিজের মনের মধ্যে। প্রাচীন গ্রীসের নরনারী তা করেনি। তারা ভয়ও পায়নি, আবার ইন্দ্রিয়গোচরতার পুলকশিহরণকে অস্বীকারও করেনি। তারা ঐ বিস্ময়কে আপন পরিবেশের সঙ্গে বারে বারে নূতন করে মিশিয়েছে, ধ্যানের বিচিত্র উপচারে গড়ে তুলেছে সৌন্দর্যের নব নব রূপ।

প্রাচীন গ্রীসের নরনারীর সেই আদিম বিস্ময়ের আদিম ধ্যানরূপ অলিম্পাস। অলিম্পাস এক বিরাট পর্বত, গ্রীসের নগাধিরাজ—যার চূড়া উঠেছে মেঘাবরণ অতিক্রম করে দৃষ্টিসীমাকে পরাভূত করে নিঃসীম নীলাকাশে। মনুষ্যদৃষ্টির উচ্চতম নাগালের প্রান্তে ঐ অলিম্পাস চূড়া দেবদেবীর লীলাভূমি—যে দেবদেবী প্রকৃতির সকল বিস্ময়ের প্রতিভূ।

দেবগণের বিরাট প্রাসাদ অলিম্পাসের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত।

সেই প্রাসাদ শ্বেত মর্মরে রচিত, রত্নখচিত তার সোপান-শ্রেণী। আর স্বর্ণমণ্ডিত তার অসংখ্য মিনার ঘিরে রয়েছে অনন্ত আকাশ, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র নীহারিকাপুঞ্জ। চিরবসন্তের রাজ্য ঐ দেবভূমি, যেখানে ফুল কখনো ঝরে না, গান কখনো থামে না। দেবগণ চিরঞ্জীব, তেমনি মৃত্যুহীন অলিম্পাসের পরিবেশ।

দুই

অলিম্পাসের যিনি অবিনশ্বর অধিকর্তা, তিনি দেবরাজ জুপিটার বা জিউস। পর্বতশিখরেরই মতো বিশাল তাঁর দেহ। আকাশস্পর্শী মাথায় কুঞ্চিত কেশদাম, কৃষ্ণমেঘের মতো ভ্রূ যুগল। আজানুলম্বিত তাঁর দুই বাহু, তোরণ-দ্বারের মতো তাঁর বিরাট ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, কটি থেকে পাদদেশ পর্যন্ত বস্ত্র-আচ্ছাদিত। হাতে তাঁর বজ্র—সৃষ্টির ভয়ালতম সংহার-প্রহরণ।

ভীমদেহী টাইটানদের বংশে জুপিটারের জন্ম। পিতা ক্রোনাসকে স্বহস্তে বধ করেন জুপিটার, ধ্বংস করেন টাইটানদের। ক্রোনাস-সন্তান অন্যান্য ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিয়ে তিনি ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠা করেন দেব-বংশের। সমগ্র সৃষ্টিকে ভাগ করেন নেন তাঁর অপর দুই ভাইয়ের সঙ্গে। এক ভাই নেপচুন বা পোসিডনকে দিলেন সমুদ্রের কর্তৃত্ব, আর এক ভাই প্লুটো বা হেডিসকে দিলেন মৃত্যু-রাজ্য পাতালের অধিকার। স্বর্গরাজ্য রইল জুপিটারের নিজের। মর্তভূমি মোটামুটি তিন ভ্রাতারই অধিকারে, আর গিরিশিখর অলিম্পাস সব দেবতারই লীলাভূমি।

জুপিটার দেবশ্রেষ্ঠ। অলিম্পাসের সব দেবদেবীর সম্মান ও ভয় তিনি আকর্ষণ করেন। তাঁর জ্ঞাতসারে তাঁর অপ্রিয় কাজ করতে কোনো দেবতাই সাহস করেন না। অন্যান্য দেবদেবীর

সম্মিলিত শক্তির চাইতে জুপিটারের শক্তি বেশি। অন্য দেবতারা একবার মাত্র তাঁর প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, কঠোর শাস্তি জুটেছিল তাদের ভাগ্যে। স্ত্রী জুনোকে তিনি হাত পা বেঁধে আকাশ থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, ভ্রাতা নেপচুন আর প্রিয় পুত্র অ্যাপোলোকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে পৃথিবীর মানুষের দাসত্ব করতে পাঠিয়েছিলেন। স্বর্গে মর্তে জুপিটার ভয়ঙ্কর।

গ্রহ-তারা-খচিত অনন্ত অন্তরীক্ষ স্বর্গপতি জুপিটারের অধিকার। তাঁর ইচ্ছায় আকাশ-মণ্ডলে নূতন-নূতন নক্ষত্র জন্মলাভ করে। মেঘপুঞ্জ তাঁর ভৃত্য, বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি তাঁর খেয়াল-খুশি। তাঁর ভ্রূকুটিতে তাণ্ডব-ঝটিকা, তাঁর ক্রোধে বজ্রপাত। তাঁর পূজা শ্রেষ্ঠ পূজা। তীক্ষ্ণচঞ্চু ঈগল পাখি তাঁর প্রিয়। সত্যনিষ্ঠ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষকে তিনি স্নেহ করেন।

দেবাদিদেবের পত্নীর নাম জুনো বা হেরা। জুপিটারের পাশে সোনার সিংহাসনে তাঁর আসন, স্বর্ণ-পালঙ্কে তাঁর শয়ন। দেবকুলের তিনি রানী। রূপের তাঁর তুলনা নেই। গর্বের তাঁর শেষ নেই। সন্তানবতী মর্তমানবীদের তিনি স্নেহ করেন, পৃথিবীর গৃহস্থবধূরাও দেবতাদের মধ্যে তাঁকেই ভয়-ভক্তি করে সবচেয়ে বেশি। ভয় করার কারণও আছে। যদি কোনো মর্তবাসিনী ঘুণাক্ষরেও তাঁকে অভক্তি দেখায়, জুনোদেবীর ঈর্ষা ও ক্রোধের হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই। পশুপক্ষীদের মধ্যে গাভী আর ময়ূর তাঁর সবচেয়ে প্রিয়।

দেবরাজের রানী হয়ে ঐশ্বর্য আর গর্ব যতোই হোক জুনোর, প্রাণে কিন্তু তাঁর শান্তি নেই। স্বামী তাঁর বশে নেই—জুনো তাঁর রানী হতে পারেন, কিন্তু জুপিটারের ভালোবাসার একমাত্র পাত্রী তিনি নন। আর কেউ হয়তো স্বর্ণ-সিংহাসনের বা স্বর্ণ-পালঙ্কের

সহ-অধিকারিণী নন, কিন্তু দেবী বা মানবীদের মধ্যে জুনোর সপত্নীর অভাব নেই। জুনো স্বামীনিষ্ঠা, কিন্তু জুপিটার একনিষ্ঠ স্বামী নন,—এই নিয়ে দেবরাজের সঙ্গে জুনোদেবীর মন কষাকষির অন্ত নেই।

জুনোর তিন সন্তান। দুই পুত্র মার্স আর ভালকান, এক কন্যা হিবি। কিন্তু তাঁর সপত্নীদের সন্তানরা ভুবন-বিখ্যাত। সপত্নী-সন্তানদের মধ্যে যাঁরা দেবতা তাঁদের কথাই নেই, যারা মানব তারাও শৌর্যে বীর্যে সৌন্দর্যে তাঁর আপন সন্তানদের হার মানায়।

তাই হিংসায় হিংসায় জুনোর মন জরো-জরো, চিন্তা তাঁর সর্বদা সর্পকুটিল। জুনোর সপত্নীদের মধ্যে ছিলেন ক্যালিস্টো, ল্যাটোনা আর আইয়ো। জুনোর ক্রোধাগ্নি এদের উপর বর্ষিত হয়েছিল। হারকিউলিসের জন্ম হয়েছিল জুপিটারের ঔরসে আর এক মর্ত-মানবীর গর্ভে। হারকিউলিস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর, অমর তাঁর বীরত্ব-কাহিনী। কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হারকিউলিসের জীবন ছিল দুঃখ-বেদনায় ভরা, ভাগ্যের অভিশাপে বন্ধুর। এর কারণ জুনো দেবীর নিবৃত্তিহীন প্রতিহিংসা।

জননীশ্রেষ্ঠা ল্যাটোনার গর্ভে জুপিটারের দুই দেব-সন্তানের জন্ম। একটি পুত্র, আর একটি কন্যা। সূর্যদেব অ্যাপোলো বা ফিবাস, আর চন্দ্রদেবী ডায়ানা বা আর্টেমিস।

গ্রীক তারুণ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক অ্যাপোলো—রূপবান, গুণবান, বীর্যবান। প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য ও ভাস্কর্যের কেন্দ্র-দেবতা তিনি। বিশ্ববিমোহন তাঁর দেহ-সৌন্দর্য, রৌপ্য-নির্মিত ধনুর্বাণে তিনি অব্যর্থ-লক্ষ্য, স্বর্ণবীণাঝঙ্কারে ত্রিভুবনে তিনি অদ্বিতীয়। চিকিৎসার তিনি দেবতা, সর্ব রোগের পরিত্রাণ তাঁর আশীর্বাদে। সূর্যদেব তিনি, সপ্তাশ্ব-বাহিত স্বর্ণরথ তাঁর বাহন। তমসাকে যেমন দূর করেন

সূর্য, তেমনি মিথ্যার অন্ধকারকে বিদূরিত করে সত্যের আলোক।. সত্যের দেবতা অ্যাপোলো।

গ্রীক ভূমিতে অ্যাপোলোদেবের শ্রেষ্ঠ মন্দির ডেলফি,—পার্নেসাস পর্বতের সানুদেশে। ডেলফির মন্দিরকে ঘিরে সমস্ত অঞ্চলই অ্যাপোলোর প্রিয় পুণ্যভূমি। ক্যাস্টেলিয়া ঝরনার জল পবিত্র, পূতসলিলা সেফিসাস নদী। দেশবিদেশ থেকে যাত্রীদল সমবেত হয় মন্দির-প্রাঙ্গণে। ধনী নির্ধন রাজা ও ফকির, অসংখ্য ভক্ত শরণাপন্ন হয় সত্যদ্রষ্টা অ্যাপোলোদেবের। এই মন্দির থেকে অ্যাপোলো দৈববাণী করেন, অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে একসূত্রে গেঁথে দেন। মানুষের ভাগ্য, মানবজাতির ভাগ্য দেবতাদের ইচ্ছা। ডেলফির বাণীতে সেই অমোঘ ইচ্ছার আভাস মর্তমানব পায়—পায় নির্দেশ, পায় সান্ত্বনা। দেবরাজ্য অলিম্পাস আর মর্তভূমির মাঝখানে যোগসূত্র স্থাপন করেন ডেলফিস্থিত অ্যাপোলোদেব।

অ্যাপোলোদেবের জমক ভগ্নী দেবী ডায়ানা। ডায়ানা চিরকুমারী, কৌমার্যের দেবী। চন্দ্রের দেবী তিনি, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তাঁরই অকলঙ্ক রূপের আভা। মর্তভূমে তিনি অরণ্যচারিণী। তাঁরই মতো চিরকুমারী সহচরী পরিবৃতা হয়ে তিনি কাননে বিচরণ করেন, ছায়া-ঘেরা সরোবরে নিভৃতে করেন স্নানকেলি। তাঁরও হাতে রৌপ্যমণ্ডিত ধনুর্বাণ। অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য, অরণ্য-শ্বাপদ শিকার তাঁর নিত্যলীলা। বনের ব্যাধ আর শিকারীরা তাঁর প্রিয়, পশুদের মধ্যে প্রিয় হরিণ। মর্তকুমারীগণ তাঁর প্রধান উপাসিকা।

আদিম বসন্ত-প্রাতে মন্থিত সাগর থেকে জন্মলাভ করেছিলেন

অনন্তযৌবনা দেবী ভিনাস বা আফ্রোদিতি। ভিনাস প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। কি দেবতা কি মানুষ, তাঁর আকর্ষণকে এড়াবার সাধ্য নেই কারুর। তাঁর অঞ্চলস্পর্শে পণ্ডিত হয় মূর্খ, স্থিতধী হয় উন্মাদ। প্রেমিক-প্রেমিকারা তাঁর উপাসনা করে, কবি কাব্য রচনা করে তাঁর স্বপ্ন দেখে, তাঁর দেহরেখার ব্যর্থ অনুকরণেও সার্থক হয় ভাস্কর।

রূপের তিনি অধিষ্ঠাত্রী। তাঁর আবাহনে প্রকৃতি নবসাজ অঙ্গে পরে,। তাঁর জন্যে বরণ-মাল্য গাঁথে নবপুষ্পদল। স্রোতস্বিনী কলস্বনা হয় তাঁর বন্দনায়, সমুদ্রহিল্লোল নাচে তাঁর আনন্দে।

সেই প্রেমের দেবী ভিনাস, যে প্রেম বাধাবন্ধনহীন। যে প্রেম শাসন মানে না, সর্বনাশকে ডরায় না। জুপিটার-পুত্র কুৎসিত-দর্শন ভালকান তাঁর স্বামী। স্বামীর প্রতি ভিনাস একনিষ্ঠা নন। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস তাঁকে দেখে ভুলেছিল, পা বাড়িয়েছিল তাঁর প্রলোভনের পথে। তার ফলে ধ্বংস হোলো ট্রয় নগর।

অলিম্পাসের দেবতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভিনাসের জন্যে পাগল। তাঁর প্রেমের জন্যে রণদেবতা মার্স, দেবদূত মার্কারি, সমুদ্রদেব নেপচুন প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী। এইসব দেবতা-দের করুণা বিতরণে ভিনাস কার্পণ্য করেননি। প্রেমই তাঁর অস্ত্র আর প্রেমই তাঁর করুণা। যেসব মর্ত মানব ভিনাসের প্রেমের প্রসাদ লাভ করেছে তাদের মধ্যে অ্যাঙ্কাইসেস আর অ্যাডোনিসের নাম উল্লেখযোগ্য। ডার্ডানিয়ানদের রাজা অ্যাঙ্কাইসেস। ভিনাস তাঁকে এক পুত্র উপহার দেন। এই পুত্রের নাম ঈনিয়াস, রোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। দেবী ভিনাসের প্রসাদ এই দুই মর্তবাসীর জীবনে অভিশাপই বহন করে এনেছিল। জুপিটারের বজ্রপাতে অ্যাঙ্কাইসেস চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যান, আর বন্য বরাহের ছদ্মবেশে মার্স নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন অ্যাডোনিসকে।

ভিনাসের আর এক পুত্র কিউপিড বা ঈরস। দেব-ঔরসে কিউপিডের জন্ম, তিনি দেবতা। কিউপিড প্রেমের দেবতা, মাতা ভিনাসের প্রিয়পাত্র। হাতে তাঁর ধনুর্বাণ, তাঁর অদৃশ্য অব্যর্থ তীর যার হৃদয়ে গিয়ে বেঁধে সে প্রেমে পাগল হয়ে যায়।

জুপিটার আর জুনোর দুই পুত্র—রণদেবতা মার্স বা আরেস ও বিশ্বকর্মা ভালকান বা হেফিস্টাস।

মার্স যুদ্ধের দেবতা,—ভাবাবেগবর্জিত ভয়াল নিষ্ঠুর তাঁর মন। পৃথিবীর মানুষে মানুষে যতো হানাহানি, ততোই তাঁর উল্লাস। যুদ্ধের ভালোমন্দ নীতি-দুর্নীতি নিয়ে তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা নেই, মহত্ত্ব আর পাশবিকতার মূল্যায়নে কোনো পার্থক্য নেই তাঁর কাছে। যুধ্যমান দু-পক্ষই তাঁর কাছে অল্পবিস্তর সমান। ধ্বংস হলেই হোলো, ধ্বংসতেই তাঁর আনন্দ। অন্য দেবতারা তাঁর প্রতি বিরূপ, কেবল দেবী ভিনাসের তাঁর প্রতি কেমন একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ,—সে আকর্ষণের কারণ তাঁর কঠিন নৃশংস পৌরুষ। পৃথিবীর মানুষ তাঁকে ভয় করে, পূজা করে কদাচিৎ।

ভালকানদেব স্বর্গের বিশ্বকর্মা। দেবদেবীরা সকলেই সুন্দর, একমাত্র ভালকান কুৎসিত। এত কুৎসিত, যে জন্মের পরই মাতা জুনোদেবী তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেন অলিম্পাস থেকে। তাতে তাঁর পা দুটি খোঁড়া হয়ে যায়। পরে তিনি আবার দেবরাজ্যে স্থান পান, খ্যাতি লাভ করেন বিশ্বকর্মা রূপে। বিরাট তাঁর কারখানা, দেবতাদের বর্ম অস্ত্র শিরস্ত্রাণ সব তাঁর হাতের তৈরি। তাঁর স্ত্রী দেবী ভিনাস, কিন্তু প্রেমের দেবীর স্বামীত্বে তাঁর প্রাণে শান্তি নেই। অমনি কুৎসিত-দর্শন খঞ্জ স্বামীতে ভিনাস দেবীর মন ওঠে না।

আশ্চর্য শিল্পী বলে স্বর্গ মর্ত উভয় স্থানেই ভালকানের খ্যাতি ও সমাদর। পৃথিবীর সমস্ত শিল্পী ও শ্রমিক তাঁর উপাসনা করে।

ভিনাসের মতো দেবী মিনার্ভা বা অ্যাথেনিও অযোনি-সম্ভবা। দেবরাজ জুপিটারের তিনি কন্যা, কিন্তু কোনো মাতা তাঁকে গর্ভে ধারণ করেননি। একদিন জুপিটার শিরঃপীড়ায় আকুল হয়ে কোনো উপায় না দেখে ভালকানকে ডাকলেন। ভালকান একটা তীক্ষ্ণ কুঠার দিয়ে জুপিটারের মাথাটা কেটে ফাঁক করতেই মাথার মধ্যে থেকে বার হয়ে এলেন পূর্ণযৌবনা মিনার্ভা দেবী। অঙ্গে তাঁর যোদ্ধবেশ। মিনার্ভা যুদ্ধের দেবী। কিন্তু অকারণ রক্তপাতের নয়। যে যুদ্ধে বহিঃশত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার আয়োজন, সেই যুদ্ধকে তিনি আশীর্বাদ করেন। যে যোদ্ধা আপন স্বদেশের গৌরবকে বিস্তৃত করবার জন্যে বিজয় অভিযান করেন, তাঁরও প্রতি মিনার্ভার আশীর্বাদ। অকুতোভয় বীরত্ব ও নিঃশঙ্ক মহত্ব,—এই দুই গুণ তার পরম প্রিয়।

জুপিটারের মস্তিষ্কজাতা মিনার্ভাদেবী জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। সভ্যতার তিনি লালয়িত্রী।

সমুদ্রের দেবতা নেপচুন বা পোসিডন জুপিটারের দ্বিতীয় ভ্রাতা। গভীর সমুদ্রের তলদেশে তাঁর বিরাট প্রাসাদ। তাঁরই আদেশে সমুদ্র কখনো হয় উত্তাল, কখনো হয় শান্ত।

সপ্ত সাগরের অধীশ্বর হয়েও নেপচুন মনে মনে জুপিটারকে হিংসা করেন। দেবরাজের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যে একবার কঠোর শাস্তিও তিনি পেয়েছিলেন। মর্তভূমিতে এখানে ওখানে একচ্ছত্র রাজত্ব-প্রচেষ্টাও তিনি কয়েকবার করেছেন, কিন্তু সফলকাম

হননি। সেই ব্যর্থতার ক্রোধ মাঝে মাঝে সমুদ্র-বন্যা হয়ে পৃথিবীতে তাণ্ডব লীলা করে গেছে।

পৃথিবীতে নেপচুন দেবের ভক্ত-সংখ্যা অজস্র। সমুদ্র-তীরবর্তী অধিবাসীরা সকলেই তাঁকে ভয়ভক্তি করে। সমুদ্রযাত্রীরা তাঁর প্রসন্নতা কামনা করে পূজা দেয়।

জুপিটারের আর এক ভ্রাতা প্লুটো বা হেডিস মৃত্যু-রাজ্যের অধিপতি। মৃত মানবের প্রেতাত্মার দল তাঁর প্রজাবৃন্দ। প্লুটো অতুল সম্পদের অধিকারী, মাটির নিচেকার সমস্ত স্বর্ণরৌপ্য ও রত্নরাজির মালিক তিনি। প্রেতরাজ্যের দেবতা হয়েও তিনি ভয়ঙ্কর মৃত্যু নন,—তিনি মনুষ্য-জীবনের পাপপুণ্যের প্রশান্ত ও বিচক্ষণ বিচারক। তাঁর প্রজাবৃন্দের মধ্যে কোনো অসন্তোষ নেই, তারা প্রভুর বিচারকে নীরবে মান্য করে, ধূসর ছায়ামূর্তি নিয়ে নিরাসক্ত প্রহর যাপন করে। প্লুটোর রানীর নাম প্রসেপিনা বা পার্সিফোন, প্রকৃতিরানী ডিমিটারের কন্যা

অলিম্পাসের অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবতা মার্কারি বা হার্মিস। জুপিটারের তিনি পুত্র, টাইটান অ্যাটলাসের কন্যা মায়া তাঁর জননী। হার্মিস চিরতরুণ সুদর্শন দেবদূত। তাঁর পাদুকাদুটিতে স্বর্গীয় ডানা, ডানা তাঁর শিরস্ত্রাণেও। এই ডানার সাহায্যে তিনি আকাশমার্গে উড়ে যান। জুপিটারের বার্তাবহ দূত তিনি, পিতার আদেশে তাঁকে ভ্রমণ করতে হয় দেশে-বিদেশে।

তিন

সিসিলি দ্বীপের এটনা আগ্নেয়গিরি খেয়াল-খুশি মতো অগ্ন্যুৎপাত করে আর সেই অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে ওঠে মেদিনী। সেদিন

পাতালরাজ প্লুটো সিসিলি দ্বীপে এসেছেন এই এটনা পর্বত পরিদর্শন করতে। কেননা ভূমিকম্প ঘটানো বা নিবারণ করা প্লুটোরই অধিকারে।

দেবী ভিনাসও এসেছিলেন সিসিলিতে তাঁর পুত্র প্রেমদেব কিউপিডকে সঙ্গে নিয়ে। প্লুটোকে দেখামাত্র ভিনাসের মনে এক মতলব খেলে গেল। তিনি প্রেমের দেবী—স্বর্গের দেবদেবী আর মর্তের মানব-মানবীর হৃদয় নিয়ে তাঁর খেলা। কিন্তু প্লুটোর প্রেতরাজ্যে তাঁর কোনো আদর নেই। পৃথিবীর সব আনন্দ-বেদনা অতিক্রম করে মৃত্যুর সিংহদ্বার ছাড়িয়ে প্লুটোর রাজ্যে যে প্রেত-প্রেতিনীরা এসে বাস করছে, তাদের হৃৎপিণ্ডে নেই রক্তধারা, নাড়িতে নেই চাঞ্চল্য। প্রেমের দেবীকে তারা পূজা করবে কী আশায়? প্রেত-রাজ্যে প্রেমদেবীর লীলা কেবল একজনকে নিয়েই সম্ভব—যিনি প্লুটো, ঐ রাজ্যের অধীশ্বর।

এটনা শহরের প্রান্তে মনোরম একটি হ্রদ, সেখানে শ্বেত মৃণাল আর শ্বেত রাজহংসের খেলা। হ্রদের তীর জুড়ে তরুশ্রেণীর ছায়া, শাখায় শাখায় অজস্র রঙিন ফুলের মেলা। ডিমিটার দেবীর কন্যা প্রসেপিনের লীলাক্ষেত্র এই হ্রদ। এখানে ফুল কখনো ঝরে না, বসন্ত কখনো আকুল হয় না বিদায়ের ব্যথায়।

প্রকৃতিদেবী ডিমিটার। তাঁরই অনুগ্রহে মঞ্জরিত হয় তরুশাখা, মুকুল ধরে ফলন্ত বৃক্ষে, শস্যশ্যামলা হয় কর্ষিত ভূমি। প্রসেপিন ফুল কুড়োচ্ছিলেন সাজি ভরে। এমন সময় হঠাৎ প্লুটো উপস্থিত হলেন সেখানে।

ভিনাসের উদ্দেশ্য সফল হবার এই শ্রেষ্ঠ সুযোগ। তিনি ইঙ্গিত করলেন কিউপিডকে, আর সঙ্গে সঙ্গে কিউপিড প্লুটোর হৃদয় লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন অদৃশ্য অব্যর্থ বাণ। পাগল হলেন প্লুটো প্রসেপিনকে

দেখে। বললেন,—ছায়াময় প্রেতরাজ্যে আমার নীরক্ত নিঃসঙ্গ জীবন এবার শেষ হবে, এই কন্যাই হবে আমার রানী।

রুক্ষপুরুষ ভীমকান্তি প্লুটোকে হঠাৎ সামনে দেখে ভয়ে শিউরে উঠলেন প্রসের্পিন। তাঁর আকাশের মতো নীল চোখে ফুটে উঠল কৃষ্ণ আতঙ্ক, তাঁর গোলাপ-রঙিন মুখমণ্ডল উঠল পাণ্ডুর হয়ে। প্লুটো বুঝলেন, আবেদন-নিবেদন করে এই ভয়ার্তের মনোহরণের চেষ্টা বৃথা, তার চেয়ে সোজাসুজি হরণ করাই বুদ্ধির কাজ।

বলিষ্ঠ তুই হাতে তিনি চেপে ধরলেন প্রসের্পিনকে, টেনে তুললেন তাঁর রথে। প্লুটোর কবলে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন প্রসের্পিন, আর্ত চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন মাকে। কিন্তু তাঁর সেই চিৎকার কেউ শুনল না,—ছিন্ন হোলো শুধু বেশবাস, ছিন্ন হোলো কণ্ঠমালিকা।

হ্রদ পার হয়ে, নগর গ্রাম পার হয়ে ছুটে চলল প্লুটোর স্বর্ণরথ। বিদ্যুৎবেগে ছুটতে লাগল কৃষ্ণকায় অশ্বযুগল। প্রচণ্ড তার ঘর্ঘর, সে বিপুল শব্দে ভয়ার্ত হয়ে মুখ লুকোলো পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী।

মর্তভূমির কোন অজ্ঞাত প্রান্তে শোক-নদী স্টিক্স, অসিতকৃষ্ণ তার জলধারা। সেই নদীর তীরে বসে আছে মৃত্যু রাজ্যের কাণ্ডারী চারন। চারন তার তরণীতে মৃত আত্মাদের নিয়ে শোক-নদীর অপর প্রান্তে পৌঁছে দেয়, যেখানে প্রেতরাজ্যের শুরু। রাজধানীর স্বর্ণ সিংহদ্বারে বসে পাহারা দেয় এক ভয়ঙ্কর তিনমুখওয়ালা কুকুর, নাম তার সার্বেরাস। প্রেতরাজ্যের অপর তিন সীমানা ঘিরে আছে আরো তিনটি নদী। তুঃখনদী অ্যাকেরন, বহ্নিনদী ফ্লিগেথন আর বিস্মৃতি-নদী লেথি।

দেবীকন্যাকে হরণ করে নির্দিষ্ট পথে নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে হলে অনেক দেরি হতে পারে, অতটা বিলম্ব করা প্লুটো যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলেন না। এক জলাভূমির মাঝখানে এসে তিনি তাঁর

রাজদণ্ড দিয়ে আঘাত করলেন মাটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক হয়ে গেল মাটি, সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে প্লুটোর রথ অন্তর্হিত হোলো পাতালরাজ্যে। নিগৃহীতা প্রসের্পিনের শেষ আর্তনাদ অদূরের পর্বতশ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হোলো ক্রন্দনের কম্পিত মূর্ছনায়।

জননী ডিমিটার এদিকে দিবারাত্র অনুসন্ধান করছেন তাঁর কন্যাকে। সমস্ত মর্তভূমি তিনি খুঁজে বেড়ালেন, কোথাও তাঁর নন্দিনীর সন্ধান মিলল না। নয় দিন নয় রাত্রি অনুসন্ধান করার পর তিনি ফিরে এলেন সিসিলি দ্বীপে। সেখানে সেই জলাভূমির ধারে হঠাৎ তাঁর চোখে-পড়ল উজ্জ্বল একটি অলঙ্কার। এই তো সেই মেখলা, যা তাঁর মেয়ে কোমরে পরত! পাতাল-প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে প্লুটোর অলক্ষ্যে প্রসের্পিন এই মেখলাটি কোমর থেকে খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

সন্তানহারা ডিমিটারের শোকের অবধি রইল না। তিনি বুঝলেন, নিশ্চয়ই তাঁর মেয়েকে হরণ করেছে কেউ। কন্যার সেই পরিত্যক্ত মেখলাটিকে বুকে চেপে ধরে তিনি করাঘাত করতে লাগলেন নিজের বুকে, ছিঁড়তে লাগলেন মাথার চুল। কে তাকে চুরি করেছে তা তিনি জানেন না, কিন্তু এই পৃথিবী থেকেই সে চুরি হয়েছে। অভিশাপ দিলেন তিনি পৃথিবীকে।

ভূমির উর্বরাশক্তিকে তিনি নিংড়ে নিলেন,—পত্রপুষ্প মুকুল তিনি ঝরিয়ে দিলেন তরুশাখার অঙ্গ থেকে, কৃষকের লাঙল তিনি ভেঙে দিলেন টুকরো টুকরো করে। সারা পৃথিবী জুড়ে অজন্মা প্রেত, শুকনো মাটিতে শুধু বন্যগুল্ম আর কণ্টকলতা। হাহাকার উঠল ঘরে ঘরে, হৃতদুহিতা প্রকৃতিদেবীর অভিশাপে দলে দলে মরতে লাগল দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নরনারী।

শোকাকুলা ডিমিটার শেষ পর্যন্ত কন্যার খবর পেলেন আরিথিউসা নদীর কাছ থেকে। গ্রীস দেশে এই নদীর উৎপত্তি,—

এর স্রোতধারা মাটির অভ্যন্তরে নেমে সমুদ্রের তলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার সিসিলি দ্বীপে এসে উঠেছে। এই নদী বললে,—কেঁদোনা প্রকৃতিরানী ডিমিটার, তোমার মেয়ের সন্ধান আমি পেয়েছি। পাতালে আমার গতিবিধি, সেখানে প্রেতরাজ্যে আমি তোমার মেয়েকে দেখেছি প্লুটোদেবের বাঁ পাশের সিংহাসনে। সুখে আছে কি দুঃখে আছে জানিনা, কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি প্রেতরাজ্যের রানী হয়েছে সে! ম্লান মুখ, ছলোছলো তার করুণ চোখ।

ডিমিটার ছুটে গেলেন আলম্পাসে দেবরাজ জুপিটারের সকাশে। বললেন,—এর বিচার চাই।

ডিমিটারের বিষাদের কাহিনী আগেই জুপিটারের কর্ণগোচর হয়েছিল, দুর্ভিক্ষপীড়িত মর্তবাসীর হাহাকার তাঁর কানে এসেছিল। জুপিটার তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—

অত্যন্ত অন্যায় করেছে প্লুটো তোমার কন্যাকে হরণ করে। এমনি গর্হিত কাজের কোনো মার্জনা নেই। কিন্তু এর মূলে হচ্ছে ভিনাস আর কিউপিড। প্লুটোর অপরাধ একশোবার, কিন্তু সে যা করেছে তা না করে উপায় ছিল না।

ডিমিটার বললেন,—ও সব আমি বুঝিনে, আমার মেয়েকে আমি ফিরে চাই।

জুপিটার বললেন,—সে তো নিশ্চয়। যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, এখন আর কে দোষী কে নির্দোষ বিচার করে কী হবে? তবে কিনা, জামাই হিসেবে প্লুটো খুব মন্দ নয়। আমার ভাই, তার উপর পাতালের একচ্ছত্র সম্রাট!

সে দস্যু,—দস্যুর হাতে আমার মেয়ে দেব না!

ঠিক কথা, জুপিটার বললেন,—চোর কখনো জামাই হয়? তবে কিনা, এক্ষেত্রে জামাই চোর হয়েছে যে! তুমি তাকে মেয়ে না

দিলেও সে যে তোমার মেয়েকে নিয়ে ঘরসংসার শুরু করে দিয়েছে। কিছু ভেবোনা, প্লুটো লোক ভালো, আমার মতো নয়। সারাজীবন মাথায় করে রাখবে তোমার মেয়েকে।

ডিমিটার এই প্রবোধে শান্ত হবার পাত্রী নন। তিনি বললেন,—না, আমার মেয়ে কিছুতেই প্লুটোর সংসারকে আপন করে নেয়নি। জলস্পর্শ করেনি সে এখনো,—প্রসের্পিন সে মেয়েই নয়। আমি শুনেছি—এখনো তার মুখখানি ম্লান, চোখদুটি ছলোছলো। তাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। নইলে—

নইলে কী হবে তা জুপিটার জানতেন। ফুল ফুটবে না, শস্য জন্মাবে না, চিরকালের মতো শুকিয়ে যাবে স্রোতস্বিনী। ধ্বংস হবে ধরিত্রী। জুপিটার কথা দিলেন,—বেশ, আমি প্লুটোকে শাস্তি দেব। তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব তোমার কন্যাকে। তবে কিনা, স্বামীগৃহের কোনো খাদ্য যদি সে না খেয়ে থাকে।

প্রেতরাজ্যে এক মুঠো অন্নও তখনো পর্যন্ত মুখে তোলেন নি প্রসের্পিন, তখনো স্বামী বলে স্বীকার করেননি প্লুটোকে। কিন্তু ভিনাসের চক্রান্ত ব্যর্থ হবার নয়। প্লুটোই বা কেন হারাবেন তাঁর বাঞ্ছিতা দয়িতাকে? জুপিটার আর জুনো যখন প্লুটোর রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন, তার একটু আগেই রাজপুরীর উদ্যান থেকে একটি ডালিম ভেঙে তার ছটি মাত্র দানা মুখে দিয়েছেন প্রসের্পিন।

ডালিমের এই ছটি দানার বিনিময়ে বৎসরের ছটি মাস,—এই হোলো দেবরাজের নিষ্পত্তি। প্রতি বৎসর ছ-মাস করে প্রসের্পিন থাকবেন পাতালে তাঁর স্বামীগৃহে,—সেই ছ-মাস পৃথিবীতে পাতা-ঝরার দিন। তার পর তিনি ফিরে যাবেন তাঁর মার কাছে বাকি ছ-মাসের জন্যে। কন্যাকে কোলে পেয়ে প্রকৃতিরানীর মুখে হাসি ফুটবে, ফুটবে পুষ্পমুকুল। এই ছ-মাসে শস্যশ্যামলা হবে ধরিত্রী, কৃষকের গোলায় উঠবে সোনার ধান।

চার

অলিম্পাসের অন্যতম দেবতা ডায়োনিসাস বা ব্যাকাস মানবীর সন্তান। জন্মও তাঁর স্বর্গে নয়, ধরিত্রীর ক্রোড়েই। দেবগোষ্ঠীর মধ্যে আসন তিনি সহজে পাননি। মর্তভূমির অধিবাসীর হৃদয়ও তাঁকে দিগ্বিজয়ের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে।

ডায়োনিসাসের মাতা মানবী হলেও তাঁর পিতা দেবশ্রেষ্ঠ জুপিটার। শ্রেষ্ঠ দেবরক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত। বিচিত্র তাঁর জন্মকাহিনী।

থীবসের রাজা ক্যাডমাসের কনিষ্ঠা কন্যা সেমিলির রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে স্বর্গরাজ জুপিটার নেমে আসেন তাঁর কাছে। তিনি এই মর্তকুমারীকে প্রতিশ্রুতি দেন সে যা চাইবে তা তিনি তাকে দেবেন।

সেমিলি কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে বললেন,—প্রভু, তুমি যে আমার মতো সামান্যা নারীকে ভালোবেসেছ তাতেই আমার জীবনের সব প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। তবে প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছ শুধু একটি জিনিস আমাকে দাও। সামান্য মানুষের মূর্তি নিয়ে তুমি আমাকে স্পর্শ করেছ। তাতে আমার মন ভরেনি। তোমার বজ্রপাণি অগ্নিময়।দেবকান্তি নিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে প্রকাশিত হও আমার চোখের সামনে।

সাঙ্ঘাতিক এই প্রার্থনা। বোধহয় জুনোর কোন জাদু ছিল এই প্রার্থনার পিছনে। মূর্খ মর্তনারীকে অনেক বোঝালেন দেবরাজ। বললেন,—তোমার এই প্রার্থনাটি তুমি সংবরণ করো

সুন্দরী, আর যা-কিছু চাও তুমি পাবে। সর্বসৌভাগ্যবতী তুমি হবে আমার বরে।

সেমিলি ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন,—প্রভু, ঐ একটি কামনা ছাড়া আর কোনো কামনা আমার নেই। তোমার প্রতিশ্রুতি তুমি রাখো।

প্রতিশ্রুতি রাখলেন দেবরাজ। বজ্রের প্রদীপ্ত পাবকে মুহূর্তে অন্ধ হয়ে গেলেন সেমিলি, ভস্ম হয়ে গেল তাঁর মরদেহ।

গর্ভে ছিল জুপিটারের সন্তান। দেবরাজ তাকে রক্ষা করলেন। দেবদূত মার্কারির হাতে তিনি নবজাতককে পাঠিয়ে দিলেন এক অজ্ঞাত কুঞ্জ-কাননে, সেখানে তার ভার নিল বনদেবীরা। নাম দিল ডায়োনিসাস। বৎসরের পর বৎসর কাটল। দেবরাজপত্নী জুনোর বহু অভিশাপ এড়িয়ে সুন্দরকান্তি যুবকে পরিণত হলেন ডায়োনিসাস। যে কুঞ্জ-কাননে তিনি মানুষ হয়েছিলেন সেখানে জন্মাতো এক আশ্চর্য লতা। তার নাম দ্রাক্ষালতা। সুপক্ক দ্রাক্ষাফলের মধ্যে আছে সৃষ্টির মধুরতম মধু, যে মধু পান করলে বিশ্বমানব দুঃখ ভোলে, অন্তরে উল্লাসের জোয়ার লাগে, পঙ্গু পায় বল, বৃদ্ধ লাভ করে তারুণ্য। বিশ্বভ্রমণে বার হলেন ডায়োনিসাস, সারা পৃথিবীতে প্রচার করলেন দ্রাক্ষার দর্শন, আত্মভোলা উল্লাসের উন্মাদনা। প্রথমে ডায়োনিসাস গেলেন মিশর রাজ্যে, সেখান থেকে লিডিয়া, ফ্রিজিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষে। যে দেশে যান, মুহূর্তে জয় করেন প্রজাদের। অগণিত ভক্তশ্রেণী, অশেষ পূজা-উপহার। দ্রাক্ষারস পান করে আনন্দে উন্মত্ত হয় নরনারী, ভুলে যায় দুঃখ বেদনা, ছিঁড়ে ফেলে শৃঙ্খল-বন্ধন। সহস্র হৃদয় চকিতে জয় করেন ডায়োনিসাস, উদ্বুদ্ধ করেন শিল্প-সঙ্গীতের প্রেরণায়।

সমস্ত পূর্ব জগতে যখন ডায়োনিসাসের দেবখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত

হোলো, তখন তিনি যাত্রা করলেন স্বদেশ অভিমুখে। গ্রীসের এক নির্জন সমুদ্রতীরে একদল জলদস্যুর চোখে পড়ল একটি অত্যন্ত সুপুরুষ তরুণ। অঙ্গে বহুমূল্য বেশভূষা। দস্যুরা ভাবল এ নিশ্চয়ই কোনো রাজপুত্র,—একে যদি হরণ করা যায় তাহলে রাজার কাছ থেকে প্রচুর মুক্তিমূল্য আদায় করা যাবে। জোর করে তারা যুবককে জাহাজে তুলল, মোটা দড়ি দিয়ে তাঁকে বাঁধতে গেল মাস্তুলের সঙ্গে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কিছুতেই যুবককে বাঁধা যায় না, শত চেষ্টা সত্ত্বেও দড়িতে গিঁট পড়ে না। আর যুবক শুধু তাদের প্রচেষ্টা দেখে মৃদু-মৃদু হাসেন।

জাহাজের বৃদ্ধ কর্ণধার অস্ফুটস্বরে বললে,—এ কী বিচিত্র লীলা! এ যুবক নিশ্চয়ই কোনো ছদ্মবেশী দেবতা—একে শীঘ্র জাহাজ থেকে তীরে নামিয়ে দাও, নইলে সর্বনাশ হবে।

দলপতি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিল বৃদ্ধ নাবিকের কথা। হুকুম দিল,—শীঘ্র পাল তুলে দাও, তীর ছেড়ে পাড়ি দাও সমুদ্রে। এক মুহূর্ত দেরি নয়।

নোঙর উঠল, অনুকূল বাতাসে পাল ফুলে উঠল, দুর্মদ প্রচেষ্টায় ফুলে উঠল দাঁড়িদের হাতের পেশী,—জাহাজ কিন্তু একচুল নড়ে না। তারপর ঘটল আরো আশ্চর্য ঘটনা। যুবক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেখানে জাহাজের পাটাতন ফুঁড়ে উঠল একটি নধর শ্যামল দ্রাক্ষালতা, মাস্তুল জড়িয়ে জড়িয়ে উঠতে লাগল সেই লতা, ছড়িয়ে গেল শাদা পালের সারা গায়ে। ফলে উঠল গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙুর আর সেই আঙুর ফেটে ফেটে সুরভি-মধুর দ্রাক্ষারসে সারা পাটাতন ভেসে যেতে লাগল। পরমুহূর্তে ছদ্মবেশী দেবতা সিংহরূপ পরিগ্রহ করে জাহাজের নাবিকদের সংহার করলেন। পরিত্রাণ পেল শুধু ঐ বৃদ্ধ কর্ণধার।

দলবল সহ ডায়োনিসাস আবার থীবস রাজ্যে এসে পৌঁছলেন : ক্যাডমাস অতি বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা আগেভ-এর পুত্র পেন্‌থিউসকে দিয়েছেন রাজ-সিংহাসন। ডায়োনিসাসকে দেবতা বলে রাজা পেন্‌থিউস মানেন না, ঘৃণা করেন তাঁর ভক্তদের পানোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে। থীবসের অন্ধ গণক টাইরে-সিয়াস সাবধান করে দিলেন, পেন্‌থিউস উড়িয়ে দিলেন ভবিষৎবক্তার কথা।

ডায়োনিসাসের আবির্ভাবের সংবাদে সমস্ত থীবসবাসী আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল। আবালবৃদ্ধবণিতা ছুটল তাঁর অভ্যর্থনায়। দ্রাক্ষারসের অমৃত পান করে আইভিলতার মালা গলায় পরে সমস্ত মেয়ে পুরুষ কাননে প্রান্তরে নেচে গেয়ে বেড়াতে লাগল ডায়োনি-সাসের নামে। সেই গানের সঙ্গে শিঙা আর করতালের রবে মুখর হোলো সারা আকাশ।

জ্বলে উঠলেন পেন্‌থিউস। এ কী অনাচার! এ কী কুৎসিত রীতি! সুস্থ মানুষ মদ খেয়ে পাগল হচ্ছে, লাজলজ্জা ভুলে উন্মাদের মতো নাচছে, যুবতীরা অঙ্গের বসন ফেলে পরছে বাঘছালের অর্ধনগ্ন সাজ, স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ ঘুচে যাচ্ছে উন্মত্ত নৃত্যগীতের তাণ্ডবে আর বাজছে কর্ণবিদারী শিঙা আর ঝাঁঝর! সংসারের বন্ধন, শালীনতার বন্ধন সব ঘুচিয়ে প্রজারা সব মেতে উঠছে অনাচারের জাতুলীলায়। কে ঐ ডায়োনিসাস—ভ্রষ্টাচার আর অপকীর্তির জনক? ধরে নিয়ে আয়, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে!

সৈন্যরা ছুটল। কিছু পরে তারা ফিরে এল রক্তাক্ত ঘর্মাক্ত দেহে। সঙ্গে বন্দী করে নিয়ে এল এক বিদেশী বৃদ্ধকে।

কে তুমি? পেন্‌থিউস হাঁকলেন,—তুমি ডায়োনিসাস?

পাগল! বন্দী উত্তর করলে,—ডায়োনিসাসকে বন্দী করার সাধ্য কার?

তাহলে তুমি কে?

আমার নাম অ্যাকিটিস,—আমার জন্মভূমি মিয়োনিয়া।

তুমি ডায়োনিসাসের সঙ্গে এসেছ?

হ্যাঁ, আমি তাঁর ভক্ত। আমি তাঁর দেশ-দেশান্তরের সঙ্গী।

সেই জলদস্যুদের জাহাজের বৃদ্ধ কর্ণধার এই অ্যাকিটিস। ডায়োনিসাসের সেই অত্যাশ্চর্য বিভূতির কাহিনী সে রাজসভায় শোনালো।

ক্রূর হাসি হাসলেন অবিশ্বাসী পেন্‌থিউস। রক্ষীদের বললেন,—নিষ্ঠুরতম অত্যাচারে বধ করো এই বন্দীকে।

রক্ষীরা টানতে টানতে ভক্ত অ্যাকিটিসকে নিয়ে গেল বন্দীশালায়। কিন্তু রাজনির্দেশ তারা পালন করতে পারল না। হঠাৎ বন্দীর অঙ্গের সমস্ত শৃঙ্খল আপনা থেকে শিথিল হয়ে গেল কোন্ জাদুমন্ত্রে যেন, আপনা থেকে উন্মুক্ত হোলো বন্দী-শালার দ্বার। মুক্ত ভক্ত তাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল শান্ত পদক্ষেপে। স্থাণু হয়ে রক্ষীরা দাঁড়িয়ে রইল, একটিমাত্র অঙ্গুলি-হেলনের শক্তিটুকু তাদের দেহ থেকে কে যেন ছিনিয়ে নিয়েছে।

তবু চৈতন্য হোলো না থীবসরাজ পেন্‌থিউসের। নির্জন রাজপুরী। দলে-দলে সকলে যোগ দিয়েছে ডায়োনিসাসের পূজা-উৎসবে। রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীরাও কেউ বাকি নেই। সবাই গিয়েছে রাজধানীর প্রান্তে সিথেরন পর্বতে,—যেখানে পর্বতচূড়া থেকে সমস্ত মালভূমি দ্রাক্ষাদেবের বন্দনাগানে মুখরিত। এ তো বন্দনাগান নয়, এ যুদ্ধের আহ্বান।—বেশ, যুদ্ধই করবেন পেন্‌থিউস। মুখোমুখি হবেন তিনি এই ডায়োনিসাসের।

নিঃসঙ্গ রাজা বার হলেন পথে। পায়ে পায়ে চললেন সিথেরন শৃঙ্গের অভিমুখে। পর্বতচূড়ার কাছাকাছি উন্মুক্ত একটি

মালভূমি। সেখানে ভক্ত নরনারীর দল উন্মাদ উৎসবে মেতেছে। নির্বাধ নৃত্য, আত্মহারা লাস্য। এক কোণে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসী মন আর অপরিস্রুত দৃষ্টি দিয়ে সেই নৃত্যোৎসব দেখতে লাগলেন পেন্‌থিউস। তাঁর উপস্থিতি প্রথমে কারুরই চোখে পড়ল না। তারপর তাঁর উপর চোখ পড়ল তাঁর জননীর। আপন পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন রাজমাতা আগেভ। তারপর চিৎকার করে সঙ্গিনীদের বললেন,—দ্যাখো, দ্যাখো, এই পুণ্য পূজাঙ্গনে একটা কুৎসিত শূকর এসে ঢুকেছে! ওটাকে মারতে পারো না তোমরা?

উন্মত্ত রমণীর দল ঝাঁপিয়ে পড়ল পেন্‌থিউসের উপর। বিপন্ন পেন্‌থিউস আত্মরক্ষার জন্যে ছুটে গেলেন মার কাছে। পুত্রের অঙ্গে প্রথম সাঙ্ঘাতিক আঘাত হানলেন জননী নিজেই। তারপর আর রক্ষা নেই।

ছিন্নভিন্ন হোলো অবিশ্বাসীর দেহ। পেন্‌থিউসের ছিন্ন মুণ্ড বর্শার মাথায় উঁচু করে তুলে ধরে থীবসের রমণীরা উৎসব-শেষে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে পাগলিনী আগেভ।

বিশ্ববিজয় সম্পূর্ণ করে অলিম্পাসের সিংহদ্বারে উপস্থিত হলেন ডায়োনিসাস। দেবসভায় তাঁকে সাগ্রহে বরণ করে নিলেন পিতা জুপিটার। দেবরানী জুনোর মুখের দিকে ডায়োনিসাস একবার তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দুঃখিনী জননী সেমিলির কথা—যে জননীকে কখনো তিনি চোখে দেখেন নি। অলিম্পাসের সুখৈশ্বর্য ছেড়ে তখনি ডায়োনিসাস যাত্রা করলেন প্লুটোর প্রেতরাজ্যে। মৃত্যু পরাভূত হোলো তাঁর কাছে, প্রেতরাজ্ঞী প্রসের্পিন তাঁর অনুরোধ রাখলেন। নবজীবিতা জন্মদাত্রী সেমিলিকে নিয়ে

তিনি যাত্রা করলেন অলিম্পাসে। বললেন,—আমার মার যদি এখানে স্থান না হয় তাহলে আমিও এখানে থাকব না।

কিন্তু ও যে মানবী,—অলিম্পাসে কেমন করে থাকবে?

মানবী? জ্বলে উঠল ডায়োনিসাসের চোখ,—দেবরাজ জুপিটারের বজ্রপাণি অগ্নিমূর্তি কোন্ মানবী চর্মচক্ষে দেখেছে? দেবসম্ভূত পুত্রের চেষ্টায় মৃত্যুর পর নবজীবন লাভ করে প্রেতপুরী থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গরাজ্যের দ্বারে কোন্ মানবী এসে দাঁড়িয়েছে?

মর্ত্তজা সেমিলিকে অলিম্পাসে স্থান দিতে স্বীকৃত হলেন জুপিটার। কালো হয়ে গেল সম্রাজ্ঞী জুনোর মুখ।

দ্রাক্ষাদেব ডায়োনিসাস উল্লাসের দেবতা, সৃষ্টির দেবতা। তাঁর পূজায় আত্মভোলা আনন্দের অভিষেক। ডায়োনিসাসের নিষ্ঠুরতারও অন্ত নেই। দ্রাক্ষারস পান করে কখনো কখনো তাঁর পূজারিণী নারীর দল উন্মাদ হয়ে যায়। তখন তারা অরণ্যকান্তারে বিবসনা হয়ে ছুটে বেড়ায়, বন্য পশুদের বধ করে চরম নৃশংসতায়। কাঁচা মাংস খায়, খল-খল করে হাসে, নাচে আর গায়। ডায়োনিসাসের এই উন্মত্তা পূজারিণীদের নাম মীনাড। মীনাডদের কোনো পূজা-মন্দির নেই। নাগরিক সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা তাদের বাঁধতে পারে না। গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে তারা ঘুরে বেড়ায়, আহার করে বন্য ফল, পান করে নদীর জল। তৃণপ্রান্তর আর পাতা-ঝরা অরণ্যভূমি তাদের বিশ্রাম-শয্যা। বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত লীলায় তারা বিভোর, তাদের উচ্ছল সুরাপাত্রে নীল আকাশের ছায়া।

দ্রাক্ষার দেবতা ডায়োনিসাস। মদে আনন্দ, আবার সেই মদেই উন্মত্ততা। মদ্য পান করে মানুষ দুঃখশোক ভোলে, আবার সেই মদের প্রভাবেই মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়। সুরা শক্তির প্রতীক। সুরা পানে মানুষের অন্তরে শক্তি সঞ্চারিত হয়, কাপুরুষতা দূর হয়,

জাগ্রত হয় আত্মবিশ্বাস আর কর্মপ্রেরণা। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সুরার ভক্ত। মদ সৃজনী-প্রতিভার সহচর। কিন্তু আবার এই মদ মানুষকে নষ্ট করে, তার চরিত্রকে দুষ্ট করে, ভাগ্যে হানে অভিশাপ। দ্রাক্ষার দেবতা ডায়োনিসাসের দান মানুষের পক্ষে অবিমিশ্র মঙ্গল-দায়ক নয়।

শীতের সঙ্গে সঙ্গে দ্রাক্ষালতা শুকোয় আবার নবপত্রপল্লবে বিকশিত হয় বসন্ত-সমাগমে। প্রর্সেপিন দেবী যখন স্বামীগৃহে যান তখন ডায়োনিসাসের মৃত্যু। আবার প্রসেপিন যখন জননীর কাছে আসেন, ডিমিটারের মুখে হাসি ফোটে,—তখন আবার ডায়োনিসাসেরও পুনর্জন্ম। আপাত-মৃত্যুর অন্ধকার থেকে ডায়োনিসাসের আত্মা বারে বারে পুনর্জীবনের গৌরব অর্জন করে। অমর আত্মার প্রতীক ডায়োনিসাস।

জেসন

এক

গ্রীস দেশ তিন দিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা,—পূর্ব, পশ্চিম আর দক্ষিণ। পূর্বদিকে ঈজিয়ান সমুদ্র, পশ্চিমদিকে আইয়োনিয়ান সমুদ্র আর দক্ষিণদিকে ভূমধ্যসাগর। অতি প্রাচীন কাল থেকে গ্রীসের উপকূলে নানা বন্দর গড়ে উঠেছে। এইসব বন্দর থেকে ভেসেছে রণতরী আর বাণিজ্যতরী; গ্রীক সভ্যতা প্রসারিত হয়েছে দেশান্তরে সমুদ্রপারে।

সেই প্রাচীন যুগে প্রথম যিনি অর্ণবপোত নির্মাণ করেন আর সীমাহীন সমুদ্রযাত্রার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাঁর নাম জেসন। ঈজিয়ান সমুদ্রবর্তী ইয়ল্‌কস রাজবংশে জেসনের জন্ম। তাঁর পিতা রাজা ঈসন তাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা পেলিউস কর্তৃক রাজচ্যুত হন। ঈসনের বংশের কাউকে পেলিউস জীবিত রাখেন নি। কেবল শিশু রাজপুত্র জেসনই কোনরকমে রক্ষা পেয়েছিলেন। পিতা ঈসন তাঁকে সমর্পণ করেছিলেন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অশ্ব-মানব সেণ্টর কাইরনের কাছে। কাইরন জেসনের পালক-পিতা,—কাইরনের শিক্ষায় জেসন নানা বিত্তার অধিকারী হয়েছিলেন।

কাইরনের আশ্রয়ে বড়ো হতে লাগলেন জেসন। কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে যখন তিনি উপনীত হলেন, তখন কাইরন তাঁকে জানালেন তাঁর পিতৃপরিচয়। বললেন,—পালকের আশ্রয় ত্যাগ করে পৃথিবীর পথে পা বাড়াবার বয়স

তোমার হয়েছে। আমার ক্ষমতা মতো সর্বশিক্ষায় তোমাকে ভূষিত করেছি। এবার ফিরে যাও তোমার নিজের রাজ্যে। পেলিউসের কাছে দাবি করো তোমার রাজসিংহাসন।

গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জেসন যাত্রা করলেন ইয়ল্‌কস রাজধানীর উদ্দেশ্যে। পথে পড়ল এক খরস্রোতা তটিনী। এই নদী পার হতে হবে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোলচর্মা বৃদ্ধা। বৃদ্ধাও নদী পার হতে চায়, কিন্তু কেমন করে? করুণা-পরবশ হয়ে জেসন বৃদ্ধাকে কাঁধে তুলে নিলেন। ক্ষুরধার নদী, প্রচণ্ড তরঙ্গ। কাঁধের উপর ঐ বিশীর্ণা বৃদ্ধার ভার যেন বেড়েই চলেছে। স্রোতের টানে জেসনের পা থেকে একপাটি পাদুকা জলে ভেসে গেল। বহু কষ্টে নদী পার হয়ে বৃদ্ধাকে ওপারে নামিয়ে দিলেন জেসন। বৃদ্ধা তাঁকে অনেক আশীর্বাদ করল,—বললে, মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, জয় হবে তোমার।

এই বৃদ্ধা মায়ারূপিনী জুনোদেবী,—অলিম্পাসের অধিষ্ঠাত্রী।

রাজধানীতে পৌঁছে রাজা পেলিউসের সম্মুখীন হলেন জেসন। হাতে তাঁর বর্শা আর তরবারি, অঙ্গে বাঘছাল। তাঁর বিশাল দেহ, উজ্জ্বল দৃষ্টি আর অনন্যসাধারণ রূপ দেখে রাজসভায় বিমুগ্ধ গুঞ্জন উঠল। কেবল বৃদ্ধ রাজা পেলিউস শিউরে উঠলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। আগন্তুকের পায়ে একপাটি জুতো। পেলিউস একদা দৈববাণী শুনেছিলেন যে এক পায়ে জুতো আর এক পা খালি নিয়ে যে লোক কোনোদিন তাঁর সামনে আসবে, সে-ই হবে তাঁর হন্তারক।

কে তুমি? স্খলিত কণ্ঠে পেলিউস শুধোলেন।

আমার নাম জেসন। রাজা ঈসনের পুত্র আমি।

কী চাও তুমি?

নির্ভীক কণ্ঠে জেসন উত্তর দিলেন,—আমার পিতার রাজ্য আপনি অন্যায়ভাবে হরণ করেছেন। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র। এ রাজ্য—এই সিংহাসন আমার!

পেলিউস কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি জানতেন তাঁর দুর্বলতা কোথায়। তিনি পরস্বাপহারী, প্রজাকুলও তাঁর উপর সন্তুষ্ট নয়।

জেসন আবার বললেন,—আপনি আমার পরমাত্মীয়, তাই আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে আমি চাইনে। রাজকোষে সংগৃহীত অর্থ আপনি গ্রহণ করুন, তারপর ইচ্ছামত আপনি অবসর জীবন যাপন করুন। যে সিংহাসনে জুপিটারের আশীর্বাদে আমার পিতা উপবেশন করেছিলেন, সে সিংহাসন আমাকে প্রত্যর্পণ করুন।

পেলিউস মিষ্ট কথায় তাঁকে তুষ্ট করতে চাইলেন এতক্ষণে। বললেন,—নিশ্চয়, এই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তুমি, এ তোমারই হবে। কিন্তু রাজা হবার উপযুক্ত তুমি, তার প্রমাণ কী? শুধু রাজার ছেলে হলেই তো চলে না,—রাজার উপযুক্ত গুণ থাকা চাই!

বেশ, কী পরীক্ষা দিতে হবে বলুন!

কুচক্রী পেলিউস ভাবলেন,—দুর্বিনীত শত্রুকে এবার তিনি কঠিন ফাঁদে ফেলেছেন। বললেন,—এই বংশের পূর্বপুরুষ ফ্রিক্সাসের আত্মার এখনো মুক্তি হয়নি। কৃষ্ণসমুদ্রের পারে কলচিস রাজ্য থেকে সোনার পশম যদি স্বরাজ্যে আনা যায়, তবেই তাঁর মুক্তি হবে। যদি তা আনতে পারো তাহলেই বুঝব তুমি এ বংশের প্রকৃত পুরুষ। তৎক্ষণাৎ এই মুকুট তোমার মাথায় পরিয়ে রাজত্বের এই গুরুভার দায়িত্ব থেকে মুক্তি নেব।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করলেন না জেসন মুহূর্তের জন্যে। বললেন,—বেশ, সে সোনার পশম আমি নিয়ে আসব।

দুই

রাজা অ্যাথামাসের পরমাসুন্দরী রানী ছিলেন নেফিলি। নেফিলি কথার অর্থ মেঘ। শরৎ-প্রভাতের শ্বেত-কোমল লঘু মেঘেরই মতো ছিল রানীর শোভন-শুভ্র মাধুর্য। রাজা-রানীর দুটি সন্তান,—ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। ছেলেটির নাম ফ্রিক্সাস আর মেয়ের নাম হেলি। পিতামাতার নয়নের মণি।

শরতের নদীর মতো কানায় কানায় পূর্ণ জীবন রাজারানীর—উচ্ছল আনন্দে ভরা। কিন্তু সুখের পূর্ণ অমৃতভাণ্ডের এককোণায় লুকিয়ে থাকে একবিন্দু দুঃখবিষ। সেই হলাহলকণা অমৃতকে দূষিত করে। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যতাপে যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরণ্য-কানন, শুষ্ক সরোবরে ক্লান্ত নয়ন মুদিত করে শীর্ণা কমলিনী, তখন রাজধানীর নিদাঘ-জ্বালা অসহ্য মনে হয় নেফিলির। মেঘবতী রানী একাকিনী চলে যান উত্তর দেশে যেখানে পর্বত-শিখরের গায়ে বাসা বেঁধেছে পলাতক শ্যামল মেঘের দল। আবার কয়েকমাস পরে গ্রীষ্মের অবসানে রানী ফিরে আসেন স্বামী-সন্তানের সকাশে।

প্রতি বৎসর একবার করে দীর্ঘ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা রাজা অ্যাথামাসের অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে তিনি আবার আকৃষ্ট হয়েছেন চিত্তহারিণী কৃষ্ণনয়না আইনোর প্রতি। নিরপরাধা নেফিলিকে পরিত্যাগ করলেন রাজা, বিবাহ করলেন আইনোকে। বিমাতার হাতে ফ্রিক্সাস আর হেলির লাঞ্ছনার অবধি রইল না। রাজপুরীর আশ্রয় থেকে তারা বঞ্চিত হোলো, ঘুচে গেল রাজসজ্জা।

রাজার মেষপালকদের সঙ্গে তারা থাকে আর ছিন্নবেশ পরে মাঠে মাঠে ভেড়া চরায়।

সপত্নী-সন্তানদের প্রতি আইনোর বিতৃষ্ণা এতেও তৃপ্ত হোলো না। বিতাড়িতা নেফিলির বিদায়ের পরবৎসর মেঘের দল আর দক্ষিণ থেকে এলো না। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, রাজ্য জুড়ে অজন্মা। শঙ্কিত হলেন রাজা, ডেলফির দৈববাণী প্রার্থনা করলেন।

যেসব পুরোহিত ডেলফির দৈববাণী আনতে গিয়েছিল তাদের প্রচুর অর্থ দিয়ে বশ করলেন আইনো। তারা ফিরে এসে অ্যাথামাসকে বললে,—ফ্রিক্সাস আর হেলিকে বলি দিতে হবে দেবতার পায়ে। একমাত্র তাদেরই রক্তে সূর্যদেব অ্যাপোলো তুষ্ট হবেন, সংবরণ করবেন তাঁর অগ্নিবাণ।

মাতৃহারা সন্তানদের মুখ একবার রাজার মনে জেগে উঠল, কিন্তু আইনোর কথায় সে স্বপ্ন ভেঙে গেল মুহূর্তে। কুটিলা আইনো বললে,—রাজা, তোমার এই অগণিত বুভুক্ষু প্রজা,—এরাও কি তোমার সন্তান নয়? অ্যাপোলোদেবের নির্দেশ অমান্য করে তোমার দুটি সন্তানকেই কি তুমি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে?

ফ্রিক্সাস আর হেলিকে রাজপুরোহিতরা নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে। অ্যাপোলোদেবের পূজা দেওয়া হবে তাদের রক্তে। হঠাৎ অন্তরীক্ষ থেকে উড়ে এল আশ্চর্য এক ভেড়া। গায়ে সোনার পশম, পিঠের দু-ধারে সোনার দুই পক্ষ। দুটি শিশুকে ভেড়াটি পিঠে তুলে নিল এক মুহূর্তে, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশপথে।

কতো নদী-প্রান্তর—কতো দেশ আর সমুদ্রের উপর দিয়ে তীব্র বেগে উড়ে চলল স্বর্ণমেষ। পিঠে তার ভাইবোন দুটি শিশু, সোনার পশম আঁকড়ে ধরে বসে আছে। এক সমুদ্র-প্রণালীর

উপর দিয়ে উড়তে উড়তে ছোট বোন হেলি পিঠ খসে পড়ে গেল, ডুবে গেল অতল জলে। সেই থেকে প্রণালীটির নাম হেলিস্পণ্ট।

ফ্রিক্সাসকে পিঠে নিয়ে স্বর্ণমেষ নামল কৃষ্ণসাগরের পূর্বপ্রান্তে কলচিস রাজ্যে। নিরাপদে যাত্রা শেষ করে স্বর্ণমেষকে জুপিটারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করল ফ্রিক্সাস। কিন্তু দৈবানুগ্রহে দূর বিদেশে পলায়ন সত্ত্বেও ফ্রিক্সাসের ভাগ্যের আঁধার কাটল না। কলচিসের নিষ্ঠুর রাজা ঈটেস চক্রান্ত করে তাকে হত্যা করলেন,—স্বর্গীয় মেষের স্বর্ণপশম-ভরা ছালটি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী এক উদ্যানে এক গাছের ডালে সেই ছালটি ঝুলছে, দিবারাত্রি পাহারা দিচ্ছে এক অপলক-চক্ষু ড্রাগন।

তিন

দুস্তর জলপথ, যার কোনো মানচিত্র এ পর্যন্ত রচিত হয়নি। কতোদিনের যাত্রা তা কারো জানা নেই, জানা নেই কোথায়ই বা দুরন্ত বাধা, অকল্পিত বিপদ। দুঃসাহসিকতায় অতুলনীয় এ অভিযান,—এ অভিযানে জেসনের সাথী হবে কে?

রোমাঞ্চিত হোলো গ্রীসের শ্রেষ্ঠ তরুণ বীরদের মন, সারা গ্রীস দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্ভীক স্বেচ্ছাসঙ্গীরা এসে জুটলেন জেসনের পাশে। টাইরিন্‌স থেকে এলেন বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিস আর তাঁর সাথী হাইলাস। থ্রেস থেকে এলেন শিল্পীশ্রেষ্ঠ অর্ফিউস, ক্যালিডন থেকে এলেন বীরাঙ্গনা অ্যাটালাণ্টা। স্পার্টার দুই রাজপুত্র ক্যাস্টর ও পোলাক্স, মার্মিডনরাজ পিলিউস, লোক্রিয়ান বীর অই-লিউস, মাইফেরনি রাজপুত্র ইফিটাস, ইলিস-এর রাজপুত্র অগিয়াস,—এদের নিয়ে সবশুদ্ধ তিপ্পান্ন জন পুরুষ ও একজন নারী হলেন এই অভিযানের অভিযাত্রী। রাজা পেলিউসের পুত্র অ্যাকাস্টাসও

এই দলে রইলেন। আর রইলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা অ্যামফিয়ারাস এবং বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অ্যাসকুলেপিয়াস। জাদুকর শিল্পী আর্গস বানালেন এক বিরাট জাহাজ। পেলিয়ন পর্বতের পাকা কাঠ দিয়ে জাহাজটি তৈরি হোলো,—তাতে পঞ্চাশটি দাঁড়। জাহাজের সম্মুখে দেবী মিনার্ভা এক মন্ত্রঃপূত কাষ্ঠখণ্ড এঁটে দিলেন। এই কাষ্ঠখণ্ড মানুষের মতো কথা বলে, দৈববাণী উচ্চারণ করে।

জাহাজের নাম আর্গো এবং এই আর্গো জাহাজের অভিযাত্রীদের বলা হোলো আর্গোনট। সূর্যদেব অ্যাপোলোর পূজায় জেসন এক-জোড়া ষণ্ড বলি দিলেন। তারপর এক প্রত্যূষের প্রথম আলোয় আর্গো জাহাজ সমুদ্রে ভাসল।

তীরভূমি থেকে সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল। রাজা পেলিউস শুধু ক্রূর হাসি হাসলেন,—সোনার পশম নিয়ে আর ফিরে আসতে হবে না বাছাধনদের, সবাইকে ধ্বংস করবে স্বর্ণ-মরীচিকা।

ঈজিয়ান সমুদ্রের উপর দিয়ে পূর্বদিক অভিমুখে যাত্রা করে লেম্‌নস দ্বীপে এসে আর্গো জাহাজ প্রথম নোঙর ফেলল। এ দ্বীপে কোনো পুরুষ নেই। সব নারীর দল। ভিনাসের অভিশাপে এ দ্বীপের নারীরা সমস্ত পুরুষ অধিবাসীকে হত্যা করেছে। বীর আর্গোনটরা দ্বীপবাসিনীদের কাছে প্রচুর আদর-যত্ন পেলেন। তাদের রানী চাইলেন জেসনকে বিবাহ করে রাজসিংহাসনে বসাতে। অন্য তরুণদের জন্যে সুন্দরীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

এমন জামাই-আদর ছেড়ে কে নড়ে? ইউলিসিস আর তাঁর সঙ্গীদল মৃণালভোজীদের দেশে যেমন অলস আরামে দিন কাটিয়েছিলেন, প্রমীলা-রাজ্যে তেমন অবসর বিনোদন করতে লাগলেন আত্মভোলা পুরুষ-রত্নের দল।

এমনি ভাবে বারো মাস কেটে গেল। তারপর আর্গোনটদের অলস স্বপ্ন ভাঙল হারকিউলিসের হুঙ্কারে।

আবার তরী ভাসল সমুদ্র-স্রোতে। আর্গো জাহাজ চলেছে পূর্বদিকে। ট্রয়ের রাজা লাওমেডনের শান্ত্রীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গভীর রাত্রে হেলিস্পণ্ট প্রণালী পার হয়ে নিরাপদে জাহাজ পৌঁছলো প্রপণ্টিস বা মার্মারা সাগরে। পানীয় জল সংগ্রহের জন্য দ্বিতীয়বার আর্গো নোঙর ফেলল কিয়স নদীর মোহানার কাছে মাইসিয়া দেশে।

এইখানে এসে আর্গোনটরা হারালেন বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিসকে। হারকিউলিসের সাথী তরুণ হাইলাস গিয়েছিল পানীয় জলের সন্ধানে সমুদ্রতীর থেকে কিছু দূরে। সেখানে ছায়াঘেরা শ্যামল প্রান্তরের মাঝখানে সে আবিষ্কার করল এক উচ্ছলা স্রোতস্বিনী। তখন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। কুলুকুলু বয়ে চলেছে তটিনী। তীরে আপেল গাছের শাখা সুপক্ক ফলভারে জলের উপর নুয়ে পড়েছে। জনমানব নেই,—খালি ফুলের মেলা আর সুরভি-আকুল সোনালি মৌমাছিদের গুনগুনানি। প্রকৃতির প্রাণ-বিমোহন লীলায় ভুলে গেল শ্রান্ত নাবিক। স্তব্ধ হয়ে নদীতীরে বসে রইল কতক্ষণ।

এই স্থান জলপরীদের লীলাভূমি। স্রোতধারার অন্তরাল থেকে জলপরীরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল হাইলাসের সুন্দর কান্তি। কিছুক্ষণ পরে হাইলাস নদীর কিনারে মুখ বাড়িয়ে দু-হাতের অঞ্জলি ভরে জল খেতে গেল। জলপরীরা চেপে ধরল তার হাত,—টেনে নিয়ে গেল তাকে নদীগর্ভে।

হারকিউলিস আর তাঁর দলবল হাইলাসের খোঁজে বার হলেন। বনে বনে নাম ডেকে ডেকে ফিরতে লাগলেন। সেই ডাকের প্রতিধ্বনি বাজল নদীর বুকে,—কিন্তু হাইলাসকে আর খুঁজে

পাওয়া গেল না। সঙ্গীদের দেরি করবার সময় নেই। নোঙর তুলতে হবে, ফেলেই যেতে হবে নিরুদ্দিষ্ট হাইলাসকে। কিন্তু হারকিউলিস সাথীকে ফেলে যেতে চাইলেন না। খোঁজা তখনো শেষ হয়নি। কিয়স নদীতীরে তিনি রয়ে গেলেন একলা।

বেব্রিকস দ্বীপে এরপর আর্গোনটরা নোঙর ফেললেন। এই দ্বীপের রাজার নাম অ্যামিকাস, সমুদ্রদেব নেপচুনের পুত্র। অ্যামিকাস প্রচণ্ড মুষ্টিযোদ্ধা। প্রকৃতিও ছিল তার ভীষণ নিষ্ঠুর। কোনো বিদেশী তার রাজ্যে পা দিলেই সে তাকে মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান করত। কেউ তার সঙ্গে পারত না,—আর পরাজয় মানেই মৃত্যুবরণ। যদি কেউ লড়তে না চাইত, তাকেও সে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত বিনা দ্বিধায়। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর আর্গোনটরা রাজার কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করলেন। অ্যামিকাস বললে,—আগে তোমাদের একজন লড়ুক তো আমার সঙ্গে, তারপর দেখা যাবে।

জেসন আর তাঁর সঙ্গীরা বুঝলেন,—মুষ্টিযুদ্ধে যদি এই বর্বর রাজাকে পরাজিত না করা যায় তাহলে রক্ষা নেই। স্পার্টার অন্যতম রাজপুত্র পোলাক্স তখন সারা গ্রীসের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বলে খ্যাত। তিনি অ্যামিকাসের আহ্বান গ্রহণ করলেন।

লোহার গোল গোল গুলি-বসানো মোটা কাঁচা চামড়ার দস্তানা হাত বেঁধে নিলেন দুই যোদ্ধা,—তারপর লড়াই শুরু হোলো। বিরাট চেহারা অ্যামিকাসের, পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু উঁচু তার মাংসপেশী। দেহের ওজনে ও শক্তিতে তার কাছে পোলাক্স তো নিতান্ত শিশু। কিন্তু কৌশলে আর ক্ষিপ্রতায় পোলাক্স তার চাইতেও দড়। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো আক্রমণ করল অ্যামিকাস, পোলাক্স প্রাণপণে আত্মরক্ষা করে যেতে লাগলেন।

প্রথমটা মারও খেতে লাগলেন প্রচুর। পোলাক্স কোনো রকমে প্রাণ বাঁচান, আর লক্ষ্য করেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্বলতা কোথায়। অ্যামিকাসও চেষ্টা করে একটিমাত্র অব্যর্থ ঘুসি মেরে প্রতিদ্বন্দ্বীকে শেষ করে ফেলতে। কিন্তু পোলাক্সের ক্ষিপ্রতায় তার বাঘা-বাঘা আঘাতগুলো ফস্কে যায়, আর সে গর্জে গর্জে ওঠে বাঘেরই মতো।

লড়াই আর শেষ হয় না। অ্যামিকাসের হাতের চরম ঘুসিটা কিছুতেই বাজের মতো ভেঙে পড়ে না পোলাক্সের মাথার উপর। বরং এখন থেকে-পোলাক্সের নিপুণ আঘাতই বারে বারে জব্দ করে অ্যামিকাসকে। অ্যামিকাসের দম ফুরিয়ে আসছে,—বুকের বিশাল ছাতিটা উঠছে নামছে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো।

হঠাৎ পোলাক্স একটা সুবিধা পেলেন। অ্যামিকাসের ক্লান্তির সুযোগ নিয়ে ডান হাতের একটা প্রচণ্ড ঘুসি বসালেন ঠিক তার নাকের উপর। মট করে ভেঙে গেল নাকের হাড়,—সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের আর একটা ঘুসি, কপাল ফেটে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে লাগল অ্যামিকাসের। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে উঠল অ্যামিকাস। তার উপর কপালের রক্ত চোখে গড়িয়ে পড়ছে, ঝাপসা হয়েছে দৃষ্টি। হাত দিয়ে চোখটা মুছতে যাবে, অমনি পোলাক্সের হাতের বজ্রমুষ্টি প্রচণ্ড আঘাত হানল তার বুকের পাঁজরে। লাফিয়ে উঠল অ্যামিকাস। ডান হাত দিয়ে খপ করে পোলাক্সের বাঁ হাতটা চেপে ধরল সে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে চরম ঘুসিটা হানল পোলাক্সের মাথা লক্ষ্য করে। বন্দী বাঁ হাতের টানের সঙ্গে সঙ্গে পোলাক্স মাথা নিচু করে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে, অ্যামিকাসের ঘুসি পোলাক্সকে স্পর্শ করতে পারল না,—উল্টে সেই বিফল ঘুসির ভারে অ্যামিকাস নিজেই টলে পড়ল এক ধারে। এক লম্ফে পোলাক্স এসে দাঁড়ালেন অ্যামিকাসের মুখোমুখি, বিদ্যুৎগতিতে ছুটল তাঁর ডান হাত প্রতিদ্বন্দ্বীর বাঁ কান লক্ষ্য করে। সেই আঘাত

সামলাতে পারল না অ্যামিকাস, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। পরমুহূর্তে পোলাক্সের বাঁ হাতের ঘুসি তার ডান কপালে পাহাড়ের মতো ভেঙে পড়ল,—চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল অ্যামিকাসের মাথা।

রাজার এই শেষ পরিণাম দেখে বিস্ময়ে আতঙ্কে হাঁ হয়ে গেল প্রজার দল। তারপর সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আর্গোনটরাও এবার দল বেঁধে যুদ্ধে নামলেন, অ্যামিকাসের প্রজাদের যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে মনের আনন্দে রাজপ্রাসাদ লুট করলেন তাঁরা। দিনান্তে জেসনের মনে পড়ল—সর্বনাশ, অ্যামিকাস যে সমুদ্রদেব নেপচুনের পুত্র! তিনি সাড়ম্বরে নেপচুনের পূজা দিলেন, তাঁর নামে সমুদ্র-তীরে বলি দিলেন কুড়িটি লাল বৃষ।

চার

আবার সমুদ্রে ভাসল জাহাজ। এবার আর্গোনটরা এসে নোঙর ফেললেন থ্রেস দেশের পূর্বাঞ্চলের অধিপতি ফিনিউসের রাজ্যে।

অ্যাপোলোদেবের বরে রাজা ফিনিউস ভবিষ্যৎদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। যে শক্তি দেবতাদের, তার অধিকার একজন মানুষ পেয়েছে, এতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন জুপিটার। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ফিনিউসের পার্থিব দুই চোখ হরণ করে তাঁকে অন্ধ করেছিলেন দেবরাজ। তাতেই জুপিটারের রোষ তৃপ্ত হয়নি, অন্ধ রাজার পিছনে তিনি লাগিয়েছিলেন হার্পি শকুনদের। এই হার্পিরা দুই বোন। মানবীর মতো তাদের মুখ, কিন্তু বিরাট শকুনের দেহ,—গায়ে তাদের অসহ্য বীভৎস গন্ধ। ফিনিউস যখনই খেতে বসতেন, তখনই আকাশ থেকে উড়ে আসত হার্পিরা,—পাখার ঝাপটে চারিদিক অন্ধকার করে গায়ের দুর্গন্ধে আর ময়লায় চারিদিক ক্লেদাক্ত করে তাঁর

আহার্য হয় খেয়ে বা নষ্ট করে উধাও হয়ে যেত আকাশে। তারা জুপিটারের আকাশচারী ডালকুত্তা, অনন্ত তাদের পরমায়ু।

সোনালি পশম সংগ্রহের পথে বাধাবিপদ কী না কী থাকতে পারে, তার পূর্বনির্দেশ পাবার আশায় জেসন আর তাঁর সঙ্গীরা ফিনিউসের দরবারে উপস্থিত হলেন। জুপিটারের শাপে অন্ধ রাজার দুরবস্থা দেখে তাঁদের চোখে জল এল। ক্ষুৎপিপাসার কাতরতায় তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছেন বৃদ্ধ ফিনিউস। সারা দিনে এক গ্রাস খাদ্যও তিনি মুখে তুলতে পারেন কি না সন্দেহ। মুখের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় হার্পিরা। কঙ্কালসার লোল দেহ। রাজা নয়—যেন ক্ষুধার্ত পথের কুকুর।

ফিনিউস বললেন,—কী হবে তোমাদের জন্যে ভবিষ্যৎবাণী করে! অ্যাপোলো দিয়েছিলেন যে শক্তি, সেই শক্তিই তো আমার কাল হয়েছে!

জেসন বললেন,—আপনাকে আমরা রক্ষা করব ঐ হার্পিদের হাত থেকে।

ম্লান হাসি হাসলেন নিত্য-ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ। বললেন,—পারবে না। মানুষের ক্ষমতা নেই। ঐ হার্পিরা জুপিটারের শকুনী।

জেসনের দলে ছিলেন মরুৎ-দেব বোরিয়াসের দুই পুত্র, ক্যালেস আর জেটিস। তাঁরা বললেন,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন রাজা। আমরা দেবসম্ভূত, বায়ুপুত্র। আকাশে আমরা উড়তে পারি। দেখব ঐ শকুনীরা আপনার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে কেমন করে পালায়!

আর্গোনটদের পানাহারে পরিতৃপ্ত করলেন রাজা। এবার তাঁর খাবার পালা। তিনি যেই খেতে বসলেন অমনি আকাশ থেকে বীভৎস হার্পিরা উড়ে এসে তাঁর আহার্য নষ্ট করে দিল। মরুৎ-পুত্ররা নগ্ন তরবারি নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাঁরা এক লাফে

আকাশে উড়লেন, তাড়া করলেন হার্পিদের। হার্পিরা যতো জোরে ওড়ে, তাঁরাও ওড়েন ততো জোরে,—হার্পিরা আকাশের যে কোণে পালায়, তাঁরাও সে কোণে ধাওয়া করেন,—হার্পিরা মুখ ফিরিয়ে আক্রমণ করতে এলে তরোয়াল দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করেন তাদের মুখ আর ডানা। এবার আর ঐ শয়তানী শকুনীদের নিস্তার নেই। হঠাৎ রামধনুর দেবী আইরিস উদয় হলেন ক্যালেস আর জেটিসের সামনে। বললেন,—সংবরণ করো তোমাদের অস্ত্র। জুপিটারের অনুচরীদের প্রাণবধ কোরো না, দেবরাজের অভিশাপ বড়ো ভীষণ!

দুই ভাই নাছোড়বান্দা। বললেন,—ফিনিউসের উপর যে অন্যায় অত্যাচার হয়েছে, তার প্রতিশোধ নেবই। অভিশাপকে আমরা ভয় করিনে।

জুপিটারের হয়ে দেবী আইরিস প্রতিশ্রুতি দিলেন যে হার্পিরা আর কখনো ফিনিউসকে বিরক্ত করতে আসবে না।

বাঁচলেন ফিনিউস। বহু বৎসর পরে তিনি আবার শান্তিতে পানাহার করতে পারলেন। শতসহস্র আশীর্বাদ করলেন আর্গোনটদের।

জেসন বললেন,—এবার আপনি আপনার অলৌকিক ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দিয়ে আমাদের এই অভিযানকে লক্ষ্য করুন। কী ভাবে আমরা সার্থক হতে পারি বলুন,—আসন্ন বিপদ থেকে সাবধান করুন আমাদের,—বলে দিন বিপন্মুক্তির উপায়।

জেসনের মুখের দিকে অন্ধ দৃষ্টি ফেরালেন বৃদ্ধ ফিনিউস। বললেন,—কলচিস রাজ্যে পৌঁছবার পর তোমাদের অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। সে সব বিপদের কথা বলে কোনো লাভ নেই, কেননা আমি জানি তোমাদের শৌর্যে আর ভাগ্যের অনুগ্রহে সে-সব বিপদ তোমরা অতিক্রম করতে পারবে। আমি পথের বিপদ

সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করে দিতে চাই। সেই বিপদ অতিক্রম করে যদি কলচিসে পৌঁছতে পার, তাহলে জয়যুক্ত হবে তোমাদের অভিযান।

নিবিষ্ট মনে আর্গোনটরা শুনতে লাগলেন ফিনিউসের উপদেশ।

ফিনিউস বলতে লাগলেন,—তোমরা জেনে এসেছ যে কলচিস রাজ্য কৃষ্ণসাগরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। হেলিস্পণ্ট প্রণালী পার হয়ে যেমন তোমরা এখানে এসেছ, তেমনি এখান থেকে জলপথে কৃষ্ণসাগরের পৌঁছতে তোমাদের অতিক্রম করতে হবে আর একটি প্রণালী,—তার নাম বসফরাস। এই প্রণালীর প্রান্তে ঠিক কৃষ্ণ-সাগরের মুখে দুটি আশ্চর্য পাহাড়ের পাহারা আছে। পাহাড় দুটি দুই তীরে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ায়, আর পরমুহূর্তে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার তারা ফাঁক হয়ে গিয়ে মুক্তি দেয় জলস্রোতকে। এই দুই পাহাড়ের চাপে যা কিছু পড়ে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তোমরা ঐ প্রণালী পার হবার আগে প্রথমে একটি পাখি ছেড়ে দেবে। যদি ছাখো পাখিটি নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেছে তাহলে তোমরা দেবতার নাম নিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টেনে প্রণালীটি পার হবে। যদি ছাখো দুই পাহাড়ের চাপে পাখিটি মারা পড়েছে, তাহলে বুঝবে তোমাদেরও নিস্তার নেই। পাহাড়ের ঐ পাহারা অতিক্রম করে কেউ কখনো বসফরাস প্রণালী পার হতে পারে নি। তোমরা যদি একবার পার হতে পারো তাহলে ঐ দুই পাহাড়ও স্থাণু হয়ে যাবে, নির্বিঘ্ন হবে কৃষ্ণসমুদ্রের জল।

শুভাশীর্বাদ নিয়ে আর্গোনটরা যাত্রা করলেন বসফরাস প্রণালীর উদ্দেশ্যে। অনুকূল বাতাস লাগল পালে, তরতর করে আর্গো জাহাজ ঢেউয়ের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। কিছু পরে আর্গোনটদের চোখে পড়ল দূর চক্রবালে আকাশচুম্বী জলোচ্ছ্বাস, কানে আসতে

লাগল মেঘগর্জনের শব্দ। দূরের দৃশ্য ক্রমে চোখের সামনে প্রকট হোলো,—দেখলেন বিরাট দুটো নীল পাহাড় একবার করে জলের মধ্যে ছুটে এসে একে অপরের গায়ে আছড়ে পড়ছে, আর তার পরেই আবার দুপাশে তীরে সরে যাচ্ছে। পাগল পাহাড়ের মাতামাতিতে সমুদ্রের জল বারে বারে ফুঁসে ফুঁসে উঠে আকাশে হাত বাড়াচ্ছে।

কী বিক্রম ঐ পাহাড় দুটোর,—যখন ঠোকাঠুকি লাগছে একে অপরের গায়ে, তখন সে ভয়ানক শব্দের কাছে সহস্র বজ্রনির্ঘোষও হার মানে। কী প্রচণ্ড মত্ততা সমুদ্রের! পাহাড় যখন চেপে ধরে তখন কালো কালো ঐরাবতের মতো ঢেউ মেঘরাজ্য স্পর্শ করতে যায়,—আবার পাহাড় যখন সরে যায় তখন শাদা ফেনার মণি মাথায় নিয়ে লক্ষ কালনাগিনীর ফণার মতো তরঙ্গরাজি হিংস্র দাপটে আকুলি-বিকুলি করে। এই বসফরাস প্রণালী! ঐ দুই মত্ত পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যেতে হবে! পাহাড় দুটি সরে যাবার আর ফিরে আসবার মাঝের ক্ষণকালটুকুর মধ্যে পার হতে হবে এই প্রণালী,—তবে পৌঁছনো যাবে কৃষ্ণসাগরে। এক লহমার বিলম্বে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে জাহাজ।

জেসন গিয়ে দাঁড়ালেন অর্ণবপোতের পশ্চাৎভাগে, বিপদের সম্ভাবনা যেখানে সবচেয়ে বেশি। জাহাজের হাল ধরবেন তিনি, দাঁড়িদের দিকে মুখোমুখি তাকিয়ে তাদের উৎসাহিত করবেন তিনি। তারপর জুনোদেবীর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে তিনি একটি শ্বেত পারাবত উড়িয়ে দিলেন আকাশে। তীরবেগে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে উড়ে গেল ঐ পারাবত। পরক্ষণেই দুই পাহাড় ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে—কর্ণ বধির হয়ে গেল তাদের আক্রমণের শব্দে, দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেল প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে। আবার যখন পাহাড় দুটি সরে

গেল তখন আর্গোনটরা দেখলেন পাখিটি নির্বিঘ্নে উড়ে গেছে,—প্রণালীর ওপারে নীল আকাশে তার উড়ন্ত শাদা পাখা দুটি ফুটে উঠেছে।

দুই পাহাড়ের ফাঁকে পরমুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ল আর্গো জাহাজ,—ছুটতে লাগল বিদ্যুৎবেগে। উন্মাদের মতো দাঁড় টানতে লাগলেন আর্গোনটরা। শক্ত হাতে হাল ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে জেসন, প্রণালীর ওপারে আকাশ যেখানে নীল সাগরের সঙ্গে মিশেছে সেই রেখাটির প্রতি তাঁর পাংশু মুখের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ফিনিউসের আশীর্বাদ সফল হোলো। আবার আছড়ে পড়ল দুই পাহাড়,—কিন্তু ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তেই বসফরাস প্রণালী পার হয়ে কৃষ্ণসাগরের তরঙ্গ স্পর্শ করেছে আর্গো। আবার ফিরে গেল দুই পাহাড় প্রণালীর দুই তীরে। কিন্তু আর ফিরে এল না, স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চিরদিনের মতো। মানুষ তাদের জয় করেছে,—কৃষ্ণসাগরের প্রবেশদ্বার চিরমুক্ত হয়েছে সর্বভবিষ্যতের জন্যে। নিত্য-কালের মতো স্তব্ধ হয়েছে গর্জন আর আক্ষেপ।

পাঁচ

কৃষ্ণসাগরের পূর্ব তীরে কলচিস রাজ্য। এখানে ফাসিস নদীর মোহানা। এই মোহানা বেয়ে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর নদী-তীরে রাজা ঈটেস-এর রাজধানী। নদীর ধারে বৃক্ষছায়ার আড়ালে জাহাজ বেঁধে জেসন আর তাঁর সঙ্গীরা রাজসকাশে যাত্রা করলেন।

রাজসভায় সিংহাসনে বসে আছেন রাজা ঈটেস। তাঁর এক পাশে তরুণ পুত্র অ্যাপ্সার্টাস, অপর পাশে তরুণী রাজকন্যা মিডিয়া। কৃষ্ণনয়না মিডিয়া রূপসী যুবতী। মায়াবিনী সে, মায়াদেবী

হিকেট-এর পূজারিণী। বিদেশী বীরবৃন্দকে দেখে বিস্ময়-বিমূঢ় সভাসদবৃন্দ।

রাজা শুধোলেন,—কে তোমরা? কোথা থেকে তোমাদের আগমন?

জেসন বললেন,—আমরা গ্রীসের অধিবাসী। ঈজিয়ান সমুদ্রবর্তী ইয়ল্‌কস রাজ্যের আমি রাজপুত্র। এরা আমার সঙ্গী।

চমকে উঠলেন কলচিসরাজ ঈটেস। এ কি সম্ভব? হেলিস্পণ্ট প্রণালীর মুখে বসে আছেন ট্রয়রাজ লাওমেডন, বসফরাস প্রণালীতে আছে দুই পাগল পাহাড়ের পাহারা,—তবু গ্রীসদেশের অধিবাসী কী করে কৃষ্ণসাগরে উপস্থিত হোলো, এসে পৌঁছলো তাঁর রাজ্যে?

বিস্ময় দমন করে রাজা বললেন,—সুদূর গ্রীসের তরুণবৃন্দ, আমার রাজ্যে স্বাগত তোমরা। পথশ্রমে তোমরা নিশ্চয় ক্লান্ত, বিশ্রাম ও পানাহার করে পরিতৃপ্ত হও।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে দলনেতা জেসনের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজকন্যা মিডিয়া। অপূর্ব-সুন্দর বীরতনু বিদেশী কুমারের প্রতি মুহূর্তে রাজকুমারীর চিত্ত আকৃষ্ট হোলো। জেসনের চোখে চোখ পড়তেই সে ক্ষণেকের জন্যে চোখ নামিয়ে নিল। জেসন তখন দৃপ্ত অথচ সংযত কণ্ঠে উত্তর দিচ্ছেন—

রাজা, আপনার করুণার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। সত্যিই আমার সঙ্গীরা সকলেই খুব পরিশ্রান্ত, কিন্তু আমাদের প্রার্থনা শুধু আপনার আতিথেয়তা নয়, অন্য কিছু।

চকিতে মিডিয়া মুখ তুলে তাকালেন। রাজা শুধোলেন,—বেশ, তাহলে বলো কী উদ্দেশ্যে তোমাদের আগমন?

জেসন বললেন,—আমার পূর্বপুরুষ ফ্রিক্সাস যে দৈব মেষের পিঠে চড়ে এদেশে এসেছিলেন, সেই মেষের সোনার পশম আপনার

কাছে আছে। সে পশমের দাবি নিয়ে আমি এসেছি। সেই পশম আপনি আমাকে দিন, আমি স্বদেশে নিয়ে যাব।

নিছক ভ্রমণের জন্যে গ্রীক তরুণরা যে তাঁর রাজ্যে আসেনি তা প্রথমেই ধারণা করেছিলেন রাজা ঈটেস। জেসনের দাবি শুনে তাঁর ভ্রূ-কুঞ্চিত হোলো, জ্বলে উঠল চোখ। বিদেশীরা তাঁর দু-চক্ষের বিষ, তার উপর এই উদ্ধত গ্রীক তরুণ কিনা ফ্রিক্সাসের বংশধর! দীর্ঘ সমুদ্রপথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পার হয়ে এল কেমন করে? পথে জাহাজডুবি হয়ে মরল না কোন্ দেবতার বরে? একবার ইচ্ছা হোলো আর্গোনটদের সকলকে বন্দী করে একসঙ্গে হত্যা করেন,—সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবলেন, পূর্বমুহূর্তেই এদের অতিথি বলে স্বীকার করেছেন যে! মায়াবিনী মিডিয়ার দিকে একবার তাকালেন, তারপর বললেন,—

ফ্রিক্সাসের সোনার পশম তোমাদের ফিরিয়ে দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে প্রমাণ করতে হবে যে সত্যিকারের বীর তোমরা। কয়েকটা বীরত্বের কাজ তোমাদের যে-কোনো একজনকে করতে হবে, যে কাজ আমি নিজেও করেছি। সোনার পশম আমার অধিকারে, আমার চেয়ে যে হীনবল তাকে আমি তা দিতে পারি না।

জেসন প্রশ্ন করলেন কী কী পরীক্ষা তাঁকে দিতে হবে।

সামান্য পরীক্ষা। দুটি মাত্র কাজ। রাজার দুটি ষণ্ড আছে, সে দুটির কাঁধে জোয়াল পরিয়ে লাঙল বেঁধে তাদের দিয়ে চাষ করাতে হবে কিছুটা জমি। তারপর সেই জমিতে বপন করতে হবে ড্রাগনের কয়েকটি দাঁত। এই কাজে যদি জেসন সফল হন, তাহলে রাজা তাঁর হাতে সানন্দে সোনার পশম সমর্পণ করবেন।

জেসন মনে মনে ভাবলেন,—দেবী জুনোর কৃপায় এতো বিপদ পার হয়ে এসেছি, তাঁর দয়ায় এ পরীক্ষাতেও জয়যুক্ত হব।

রাজাকে বললেন আগামী কাল প্রভাতেই তিনি এই পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন।

অমায়িক হাসি হাসলেন রাজা।

সেদিন রাত্রে ঘুম এল না রাজকুমারী মিডিয়ার চোখে। বিদেশী রাজপুত্র জেসনের মুখের দিকে যে মুহূর্তে তার চোখ পড়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রেমের দেবতার অব্যর্থ শরসন্ধান স্পর্শ করেছিল তার হৃদয়। দেবোপমকান্তি তরুণ বীরের জন্যে উদ্বেলিত তার অন্তর। কিন্তু বৃথা এই আকর্ষণ,—ক্ষণিক এই মোহ। মিডিয়া জানত রাজার পরীক্ষার অর্থ। এই পরীক্ষায় কোনো মানুষ সফল হতে পারে না,—এ পরীক্ষার সম্মুখীন যে হয়, তার ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবী নিষ্ঠুর মৃত্যু। একমাত্র মায়াবলেই এই পরীক্ষায় জয়ী হওয়া সম্ভব। সেই মায়ার অধিকারিণী মায়াবিনী মিডিয়া।

উষ্ণ উপাধানে মাথা রেখে বিনিদ্র চোখে ভাবতে লাগল মিডিয়া। কেন এমন হোলো? কেন তার সমস্ত দেহমন ছুটে যেতে চায় ঐ বিদেশী জেসনের কাছে আত্মসমর্পণের উধাও আবেগে! এমন অনুভূতি কখনো তো সে অনুভব করেনি! এর নাম প্রেম? কাল প্রত্যূষে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে আত্মবলি দেবে তার প্রেমাস্পদ,—আর তাই সে শুষ্ক চোখের অনাসক্ত দৃষ্টি মেলে দেখবে কেমন করে?

গভীর রাত্রে জেসনের বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করল মিডিয়া। ঘুমন্ত জেসনের ক্লান্ত মুখের দিকে বারেক দেখল চুপ করে, তারপর ঘুম ভাঙালো তাঁর।

জেসনের হাতে মিডিয়া দিল মন্ত্রঃপূত কয়েকটি শিকড়, জানিয়ে দিল তাঁকে পরীক্ষা-জয়ের রহস্য। কৃতজ্ঞ জেসন তার হাত ধরে

প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি তাকে বিয়ে করবেন,—সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন স্বদেশে।

পরদিন প্রত্যুষে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে রাজসভা বসল। রক্তবর্ণ রাজবেশ পরে স্বর্ণ সিংহাসনে বসলেন রাজা ঈটেস। তাঁর দুই ধারে রাজপুত্র আর রাজকন্যা। চারধারে পাত্রমিত্র সভাসদ আর অগণিত দেশবাসী। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জেস৹। হঠাৎ প্রবল গর্জন করতে করতে ছুটে এল দুই বিরাট ষাঁড়। হস্তীর মতো বিরাট দেহ, পায়ের খুর আর মাথার শিং পিতল দিয়ে মোড়া, লাল গনগনে লোহার মতো দুই নাক দিয়ে বার হচ্ছে আগুন আর ধোঁয়া। তাদের পদদাপে ভূমিকম্প, তাদের নিশ্বাসে যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উচ্ছ্বাস। তাদের কাছাকাছি যে: যায়, মুহূর্তমধ্যে কালো অঙ্গারে পরিণত হয় তার দেহ। দূর থেকে একবার হিংস্র চোখ মেলে জেসনের দিকে তারা তাকাল, তারপর ছুটে এল ভীম বেগে। মিডিয়ার মন্ত্রঃপূত ওষধির গুণে ঐ ষাঁড়ের অগ্নি-নিশ্বাস জেসনের কোনো ক্ষতি করতে পারল না। জেসন দু-হাতে দুই ষাঁড়ের মাথার শিং ধরে সজোরে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দিলেন। এই অপ্রত্যাশিত অথচ ভয়ঙ্কর আঘাতে ষাঁড় দুটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে জেসন তাদের কাঁধের উপর জোয়াল পরিয়ে দিলেন। কাঁধে জোয়াল পরানোমাত্র ষাঁড়দুটি বুঝল তাদের হার হয়েছে, আর বাড়াবাড়ি করলে হয়তো প্রাণেও বাঁচবে না। শান্তশিষ্ট হয়ে তারা জেসনের নির্দেশ মেনে নিল, জোয়ালের পিছনে লাঙল লাগিয়ে জেসন অল্প সময়ের মধ্যে জমিটা চাষ করে ফেললেন।

এর পরে দ্বিতীয় পরীক্ষা। লাঙল-চষা মাঠে জেসন ড্রাগনের দাঁতগুলি বপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফুঁড়ে উঠল অঙ্কুর। অঙ্কুরগুলি ফুটে উঠল শিরস্ত্রাণ হয়ে, আর মুহূর্ত পরেই শিরস্ত্রাণ

মাথায়, বর্ম গায়ে আর সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শত শত সৈনিক মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একযোগে জেসনকে আক্রমণ করল। এতোগুলি সশস্ত্র সৈনিকের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা বীরশ্রেষ্ঠের পক্ষেও অসম্ভব। কিন্তু মিডিয়া জেসনকে শিখিয়ে দিয়েছিল পরিত্রাণের উপায়। জেসন চকিতে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে এই নবজাত সৈন্যদের ভিড়ের ঠিক মাঝখানে মস্ত একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেন। কে মেরেছে পাথর? কার এতো সাহস? সৈন্যদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল,—ঝগড়া থেকে লড়াই। সে কী হিংস্র যুদ্ধ! উন্মাদের মতো পরস্পরকে আক্রমণ করল তরোয়াল দিয়ে বর্শা দিয়ে, যে যাকে পারে হত্যা করতে লাগল নৃশংস আঘাতে আঘাতে। জেসন অদূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন সেই বীভৎস কাণ্ড। দর্শকরা বিমূঢ় বিস্ময়ে দূর থেকে দেখতে লাগল সেই অদ্ভুত লড়াই। লড়াই যখন শেষ হোলো তখন একজনও জীবিত নেই, জেসনের কর্ষিত মাঠে অসংখ্য মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন জেসন,—নিরস্ত্র দেহে একটি আঁচড়ও লাগে নি।

হঠাৎ চমক ভাঙল হতবাক দর্শকদের। চীৎকার করে জেসনের জয়ধ্বনি করতে লাগল তারা। শুধু কালো হয়ে গেল রাজা ঈটেসের মুখ, নিরুদ্ধ ক্রোধে জ্বলে উঠল তাঁর চোখ।

জেসন রাজার কাছে এসে বললেন,—এবার দিন আমাকে সোনার পশম।

মনোভাব গোপন করে কপট হাসি হেসে রাজা বললেন,—দেব দেব, কালই পাবে। আজ বড়ো ক্লান্ত হয়েছ, একটা দিন বিশ্রাম করে নাও।

পিতার চোখের ঐ শাণিত দৃষ্টি মিডিয়ার চোখ এড়ায় নি। সে বুঝেছিল এই একটি দিনের মধ্যেই জেসন আর তাঁর সঙ্গীদের বধ

করবার কোনো অভিসন্ধি রাজা স্থির করে ফেলবেন। কাল প্রভাতের মুখ আর আর্গোনটদের দেখতে হবে না। রাজাও মনে মনে মিডিয়াকে সন্দেহ করেছিলেন। তার সাহায্য ছাড়া ঐ বিদেশী এমনি অসাধ্য সাধন করল কেমন করে ?

সেইদিন সন্ধ্যা হতে না হতে মিডিয়া আবার গোপনে সাক্ষাৎ করল জেসনের সঙ্গে। তাকে বললে,—আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না। আজই রাত্রে সোনার পশম হরণ করে পালাতে হবে কলচিস রাজ্য ছেড়ে।

মিডিয়া আবার জেসনকে দিল এক নূতন মন্ত্রঃপূত ওষধি আর দিল নূতন মন্ত্রণা। রাত্রি অন্ধকার হতে সঙ্গীরা সবাই নিভৃতে গিয়ে জমায়েত হলেন নদীতীরে আর্গো জাহাজের কাছে। মিডিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেসন চললেন সোনার পশমের সন্ধানে।

রাজপুরীর পিছন দিকের উদ্যান। সেখানে এক কোণে এক গাছে বাঁধা আছে সোনার পশম। আর তাকে পাহারা দিচ্ছে এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন,—পাহারা দিচ্ছে দিনরাত্রির প্রতি মুহূর্ত,—অতন্দ্র ভয়াল রক্তচক্ষু মেলে। কাছাকাছি যেতেই সোনালি আভায় ঝলসিয়ে গেল জেসনের চোখ। ঐ তো সেই দেবপ্রেরিত মেষের সুবর্ণচর্ম,—যে মেষ সুদূর জন্মভূমি থেকে প্রথম গ্রীক ফ্রিক্সাসকে নিয়ে এসেছিল কৃষ্ণসমুদ্র পারের এই কলচিস রাজ্যে। ঐ রয়েছে সেই আশ্চর্য ঐশ্বর্য, যার সন্ধানে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা মৃত্যুকে শিয়রে রেখে সমুদ্রের লক্ষ লক্ষ লেলিহান তরঙ্গকে উপেক্ষা করে এই অভিযানের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। ঐ সুবর্ণরোমোজ্জ্বল মেষচর্ম উদ্ধার করে কবে আবার আর্গোনটরা স্বদেশে ফিরবে, সার্থক হবে তাদের জয়োদ্দীপ্ত অভিযান,—জন্মভূমি জননী তারই জন্যে যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে বরমাল্য হাতে নিয়ে।

আর সঙ্গে সঙ্গে জেসনের কানে এল ড্রাগনের ভয়াল গর্জন।

জেসন অতি সন্তর্পণে ড্রাগনটার কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন, তারপর তার চোখে ছুঁড়ে মারলেন মিডিয়ার জাদু-ওষধি। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। এক লাফে গাছের কাছে গিয়ে জেসন মেষচর্মটি হাতে তুলে নিলেন, তারপর তরবারির এক নির্ভুল আঘাতে কাটলেন ঘুমন্ত ড্রাগনের মাথাটা। অদূরে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল মিডিয়া। মিডিয়ার হাত ধরে তিনি ছুটলেন আর্গো জাহাজের উদ্দেশ্যে।

অনতিবিলম্বে জাহাজ ছাড়ল। পালে লাগল অনুকূল বাতাস। নিঃশব্দে ফাসিস নদীর মোহানা পেরিয়ে আর্গো জাহাজ পৌঁছল কৃষ্ণসাগরে। প্রেমের দেবী ভিনাস আর অধিষ্ঠাত্রী দেবী জুনোর নাম নিয়ে জেসন শপথ করলেন, এই বিদেশিনী করুণাময়ী রাজকন্যা মিডিয়া তাঁর একমাত্র প্রেয়সী পত্নী, তাঁর সারা জীবনের সহচরী। পিতৃভূমিকে বঞ্চনা করে জন্মের মতো পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে চলে যেতে দূর চক্রবালের দিকে তাকিয়ে মিডিয়ার চোখ জলে ভরে এল। সাদরে সে অশ্রু মুছিয়ে দিলেন জেসন।

ছয়

সেদিন ইয়ল্‌কস রাজ্যের চতুঃসীমা জুড়ে কী উৎসব! দূর দূর দেশ থেকে গ্রীসবাসীরা এসেছে উৎসবে যোগদান করতে। মন্দিরে মন্দিরে কতো পূজা-উপচার, কতো বৃষবলি, কতো ধূপারতি। পথে পথে নৃত্যগীত, গৃহে গৃহে আমন্ত্রণের মেলা। আর্গোনটরা নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন স্বদেশে, সঙ্গে এনেছেন বহুবাঞ্চিত স্বুবর্ণমেষচর্ম।

রাজা পেলিউসের কেবল মুখ কালো। তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করতে নারাজ, জেসন তাঁর চক্ষুশূল। সিংহাসনের দাবি নিয়ে জেসনের যতো না ব্যস্ততা, তার চেয়ে অনেক বেশি মর্মবেদনা

বৃদ্ধ পিতা ঈসনের জন্যে। বৃদ্ধ ঈসন মৃত্যুপথযাত্রী। পুত্রের গৌরবে শীর্ণ মুখে হাসিটুকু ফোটাবার পর্যন্ত শক্তি নেই। মিডিয়াকে জেসন বললেন,—আমার জীবনের অনেকগুলো বৎসর যদি আমি পিতাকে দান করতে পারতাম, তাহলে সার্থক হত আমার গৌরব।

পিতৃপরিত্যক্তা মিডিয়ার মন ভিজল। জাতুকরী সে, স্বামীর বাসনা সে পূর্ণ করবে। বললে,—তোমার জীবনের প্রয়োজন নেই। তোমার পিতাকে নবজীবন দিতে আমিই পারব।

পূর্ণিমার দিন মধ্যরাত্রে মিডিয়া একাকিনী বার হোলো পথে। পশুপক্ষী মানুষ সবাই ঘুমে অচেতন, চন্দ্রিমার আচ্ছাদনে নিষুপ্তা নিঃশব্দা ধরিত্রী। একমনে প্রার্থনা করল সে মায়াদেবী হিকেটের উদ্দেশ্যে। দেবী পাঠালেন তাঁর আকাশচারী রথ। সেই রথে উঠে অদৃশ্য হোলো মিডিয়া।

নয় দিন নয় রাত্রি পরে মিডিয়া ফিরে এল মন্ত্রঃপূত ওষধি নিয়ে। সেই ওষধির সঙ্গে কৃষ্ণমেষের রক্ত আর শ্বেতগাভীর দুগ্ধ মিশিয়ে সে তৈরি করল এক আশ্চর্য যৌবন-রস। তারপর মুমূর্ষু ঈসনের দেহের রক্ত নিংড়ে নিয়ে সেই যৌবন-রস সঞ্চালিত করল বৃদ্ধের বিশুষ্ক ধমনীতে। নব-যৌবন লাভ করলেন ঈসন।

এর পর পেলিউসের উপর চরম প্রতিশোধ নিল স্বামী-শুভাকাঙ্ক্ষিনী জাতুকরী মিডিয়া। ঈসনের নবজীবন লাভে বড় লোভ হোলো পেলিউসের। তিনি মিডিয়াকে ধরলেন, তাঁরও নবযৌবন চাই। মিডিয়া কি তাঁরও বয়স কমিয়ে দিতে পারে না? তিনি রাজ্য চান না, যৌবন চান। তা যদি পান, তাহলে মুহূর্তে এই রাজসিংহাসন ছেড়ে দেবেন। রাজি হোলো মিডিয়া। পেলিউসের কন্যারা আপন হাতে পিতার গলা কেটে তাঁর দেহের সব রক্ত ক্ষরণ করল। মিডিয়া তাঁর দেহে সঞ্চালিত করল এক ভয়ঙ্কর জাতুরস, সে রস জীবন-সুধা নয়, মৃত্যুবিষ।

ছুটে এলেন জেসন। বললেন,—এ কী তুমি করলে মিডিয়া!

জাতুকরী তখন খল-খল হাসছে। বিগলিত কণ্ঠে প্রেমোন্মাদিনী বললে,—প্রতিশোধ নিয়েছি, তোমারই জন্যে। তোমাকে যে ভালোবাসি, সেইজন্যে!

এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর ইয়ল্‌কস রাজ্যে আর স্থান হোলো না জেসনের। দেশবাসীগণের নির্দেশ মান্য করে তিনি নির্বাসিত হলেন স্বরাজ্য থেকে। মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন করিন্থ রাজ্যে। এখানে সুখে শান্তিতে তাঁদের দশটি বছর অতিবাহিত হোলো।

এই দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন জেসন। বিদেশিনী পত্নীর অনুরাগের তীব্রতা দিনে দিনে তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলল, এতোদিনেও যেন আপন করে নিতে পারলেন না এই মায়াবতী জাতুকরীকে। ওদিকে থীবসের রাজকুমারী গ্লস-এর প্রতি জেসন আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিতে রাজা ক্রিয়নও উৎসুক। রাজ্যহারা জেসন এও ভাবেন যে রাজকুমারীকে বিবাহ করলে অচিরে রাজা হবেন তিনি নিজেই।

মিডিয়াকে ত্যাগ করতে চাইলেন জেসন। বললেন,—আমার নব-বিবাহের সানাই এবার বাজবে। তার আগে তুমি দূর হও।

মিডিয়া বললে,—তুমি কি আর আমাকে একটুও ভালোবাসো না জেসন? তোমার মনের কোণে কোথাও কি আমার সামান্যতম স্থানও নেই?

জেসন বললেন,—না।

মিডিয়া আবার বললে,—অতীতের কোনো কথাই কি তোমার মনে পড়ে না? গ্রীসের শ্রেষ্ঠ বীর বলে তোমার সম্মান, সে সম্মান

আমারই দান। তোমার এই জীবন, এও আমারই দান। তোমার জন্যে আমার পিতৃভূমিকে আমি বঞ্চনা করে চিরনির্বাসিতা হয়েছি, তোমারই মুখ চেয়ে বিষধরা জাত্মকরীর তুর্নাম বহন করেছি,—তোমার দেশে এসে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব সমর্পণ করেছি তোমার প্রেমের অর্ঘ্য রূপে,—তা কি তুমি জানো না ?

জেসন বললেন,—অতীত আমার কাছে স্বপ্ন, মুছে যাক সে স্মৃতি থেকে। ভবিষ্যৎই আমার জীবন, সে ভবিষ্যতে তোমার স্থান নেই।

বেশ, তুমি যা চাও, আমিও মুছে যাব।

মিডিয়ার বিদায়ের দিন এল। ওদিকে রাজপুরীতে বাজছে উৎসবের বাঁশি। রাজকুমারী গ্লস-এর কাছে মিডিয়া পাঠাল তার বিদায়কালের উপহার,—আশ্চর্য সুন্দর একটি পোশাক, আর একটি স্বর্ণমুকুট। বার্তা পাঠালো—বোন, আজ আমার বিদায়ের দিনের ক্ষুদ্র উপহারত্বটি তুমি গ্রহণ করো। এই পোশাক আর এই মুকুটটি আজই যদি পরো তো বড়ো খুশি হব। আমার জীবনের যা প্রিয়তম, তা তোমার হোলো আজ থেকে। আশীর্বাদ করি চির-সৌভাগ্যবতী হও।

মিডিয়ার বার্তায় অশ্রুসজল হোলো রাজকুমারীর চোখ। আবার উপহার দেখে সেই চোখে ফুটল ঔৎসুক্যের আলো। তাড়াতাড়ি সেই পোশাক আর মুকুট তিনি পরলেন। পূর্ণ হোলো মিডিয়ার প্রতিহিংসা। মুহূর্তের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল রাজকুমারীর সর্বশরীরে। মাথার মুকুট থেকে লেলিহান শিখা বার হতে লাগল। ঝলসে যেতে লাগল সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। প্রাণপণে চেষ্টা করেও সেই অগ্নি-পোশাক আর মুকুট তিনি খুলে ফেলতে পারলেন না। তাঁর আর্ত চীৎকারে রাজপুরীর সবাই ছুটে এল। রাজা ক্রিয়ন এসে জাপটে ধরলেন কন্যাকে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিযন্ত্রণা শুরু হোলো

তাঁরও দেহে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র,—তারপর কৃষ্ণ অঙ্গারবর্ণ পিতা ও কন্যার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

জেসনকে অভিশাপ দিল মিডিয়া। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল কী অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন কৃষ্ণসাগরের তীরে স্বর্ণপশম হরণ করে ফিরবার মুহূর্তে। বিশ্বাসকে যে বধ করেছে, প্রেমকে যে হত্যা করেছে,—মিডিয়ার অভিশাপ থেকে সেই পুরুষের মুক্তি নেই। তারপর মিডিয়া আহ্বান করল মায়াদেবী হিকেটকে। হিকেটের আকাশচারী রথে উঠে সে অন্তর্ধান করল, জেসনকে পরিত্যাগ করে গেল চিরজীবনের মতো।

মিডিয়ার অভিশাপে জেসনের ভবিষ্যৎ হোলো ধূসর অন্ধকার। রাজ্যহারা পত্নীহারা সংসারহারা জেসন মানব-সমাজ থেকে দূরে সরে গেলেন। দিনে দিনে ছায়া-গোধূলি নেমে আসে জীবনের উপর। সমুদ্রের তীরে যেখানে সেই পুরানো আর্গো জাহাজখানা তখনো বাঁধা আছে, সেইখানে সেই জাহাজের পাশে চুপ করে বসে থাকেন নিঃসঙ্গ জেসন। অতীত জীবনের ঘটনাবলী মনের মুকুরে ছায়াছবির মতো ঘুরে ঘুরে যায়। রৌদ্রে জলে জাহাজের রং মুছে গেছে, তেমনি লোকের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে জেসনের নাম। জাহাজের কাঠে ঘুন ধরে, তেমনি জরা এসে অধিকার করে তাঁর দেহ। একদিন জাহাজের পাটাতনের একটা কাঠ ভেঙে পড়ল ঠিক জেসনের গায়ের উপর। হঠাৎ-আঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন জেসন, সে মূর্ছা আর ভাঙল না।

সমুদ্রতীরে আর্গো জাহাজের পাটাতনের নিচে সমাধিস্থ হোলো জেসনের দেহ।

হারকিউলিস

এক

দেববিদ্রোহী টাইটান প্রমিথিউস সৃষ্টি করেছিলেন মাটির মানুষ। আর এই মানুষের সঙ্গিনী মানবী সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্বকর্মা ভালকান দেবরাজ জুপিটারের নির্দেশে।

মর্তমানবীর প্রতি জুপিটারের আকর্ষণের অবধি ছিল না। নিত্য নূতন মানবীর প্রলোভনে তিনি অলিম্পাস থেকে মর্তভূমিতে নেমে এসেছেন, উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য নানা অবস্থায় নানা ছলচাতুরীরও আশ্রয় নিয়েছেন। এইসব পার্থিব সপত্নীদের প্রতি দেবসম্রাজ্ঞী জুনোর ক্রোধের অবধি নেই,—যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন তখনই স্বামীস্পর্শিতা দুর্বলা পার্থিব নারীদের উপর সাঙ্ঘাতিক প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছেন। স্বামীসোহাগিনী মানবীদের শাস্তি দিয়েই শুধু জুনো তৃপ্ত হননি, স্বামীর ঔরসজাত মানবী-সন্তানদের ভাগ্যকে বিষাক্ত করে তুলতেও তিনি চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে নানা চক্রান্ত করতে কার্পণ্য করেন নি দেবসম্রাজ্ঞী।

প্রমিথিউসের সৃষ্টির মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন জুপিটার। মর্ত মানবের গুরুত্ব বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। তাই মানব-সমাজের প্রথম যুগে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের পর নূতন করে মনুষ্য-সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। তিনি বুঝেছিলেন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মানুষ। এই মানুষ একদিন তাঁর বজ্রের শক্তিকে সংহত করবে আপন মস্তিষ্কে, তাঁর অলিম্পাসের অমরত্বকে অর্জন করবে ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে। মাটির মানুষ মরণশীল, কিন্তু মনুষ্যত্বের শিখর ছাড়িয়ে যাবে দেবত্বকে। অলিম্পাসের দেবচরিত্রে ভালো-মন্দ উভয়েরই

সমন্বয়। যা কিছু মন্দ তা অতিক্রম করবে মানুষ, যা কিছু ভালো তা রক্ষা করবে মানুষ। কালজয়ী মানুষ দৈত্যের হাত থেকে দেবতাকে বাঁচাবে, মানুষই হবে দেবতার পরিত্রাতা। ধ্যানের মধ্য দিয়ে উপাসনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে মানুষই দেবত্বকে অবিনশ্বর করে রাখবে।

শেষবারের মতো দেবাদিদেব জুপিটার মর্তমানবীতে উপগত হবার আকাঙ্ক্ষা করলেন। অনেক মর্ত নারীর সংস্পর্শে তিনি এসেছেন,—মুহূর্তের কামনায়। তারপর তারা তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। জুনোর নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় দুর্বিসহ হয়েছে অনেকেরই জীবন,—কাউকে জুপিটার রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, চিরতরে ভুলে গেছেন অনেককেই ক্ষণিক খেয়ালের অবসানে। কোনো কোনো নারী দেবরাজের করুণায় মাতৃত্বের ঐশ্বর্যে গরীয়সী হয়েছে। দুর্ভাগিনী জননীর ভাগ্য খ্যাতিমান সন্তানের গৌরবে আলোকিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কোনো কোনো ধরণীকন্যা শুধু বঞ্চনার অশ্রুজলে অতিবাহিত করেছে ব্যর্থ তিক্ত জীবন। একাধিক মর্তমানবীর প্রতি দেবতার প্রেম চকিত বাসনার উন্মাদনা,—তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু এবার জুপিটারের আকাঙ্ক্ষা অন্যতর। এবার তিনি মানবীর কাছে শুধু সান্নিধ্য-বিলাস চান না, চান সন্তান। এমন মানবীপুত্র তিনি চান যে হবে পরম শক্তিমান মহামানব, মানবী-গর্ভসঞ্জাত হয়েও যে হবে দেবকুলের রক্ষক। শৌর্যে বীর্যে ক্ষমায় তিতিক্ষায় যে হবে অতুলনীয়, দেবমানবের সর্ব গৌরবে যার চরিত্র হবে বিভূষিত। বিপদের বন্ধুর পন্থায় যে হবে চির-অভিযাত্রী অকুতোভয়, দুঃখের পরম পাবকে পরিশুদ্ধ যার আত্মা হবে মহা-মৃত্যুঞ্জয়।

এমন পুত্র তাঁকে উপহার দেবে কোন্ নারী?

সেই নারীর নাম আল্কমিনা,—ট্রোয়েজেনরাজ অ্যাম্ফিট্রিয়নের রানী। আল্কমিনার পিতামহ ছিলেন মহাবীর পার্সিউস, পিতা মাইকেনিরাজ ইলেকট্রিয়ন। ভাগ্যদোষে অ্যাম্ফিট্রিয়ন স্বরাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। স্ত্রী আল্কমিনাকে নিয়ে তিনি থীবস রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। মহা যোদ্ধা অ্যাম্ফিট্রিয়ন। থীবসরাজ ক্রিয়ন তাঁকে সম্মানিত করেছেন।

একবার অ্যাম্ফিট্রিয়ন গিয়েছেন যুদ্ধে। এমনি সময় স্বামীর ছদ্মবেশে দেবরাজ জুপিটার আল্কমিনার কাছে উপস্থিত হলেন। দেবাদিদেবের আদেশে তিন দিন ছুটি নিলেন সূর্যদেব, তিন দিন বিশ্রাম করল তাঁর রথের সপ্তাশ্ব। ছদ্মবেশী জুপিটার আল্কমিনার সঙ্গে নিঃবচ্ছিন্ন ত্রিযামিনী অতিবাহিত করবার পর বিদায় নিলেন।

যুদ্ধাবসানে গৃহে ফিরে এলেন অ্যাম্ফিট্রিয়ন। জুপিটারের ছল স্বামী স্ত্রীর অজানার রইল না। কিন্তু তখন আল্কমিনার গর্ভে জুপিটারের সন্তান।

এই সন্তান মানবশ্রেষ্ঠ হারকিউলিস বা হেরাক্লেস।

-

হারকিউলিস বীরশ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো শক্তিশালী মানব দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করে নি। শুধু তাই নয়, আত্মবিশ্বাসেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি জানতেন তিনি দেবোপম, তিনি অপরাজেয়। স্বর্গ-মর্ত-পাতালে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। দেবদেবীদেরও তিনি ভয় করতেন না। বরং স্বর্গের দেবতারা তাঁর অনুগ্রহে একবার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। একবার পরিশ্রান্ত দেহে রৌদ্রের দাবদাহ অসহ্য মনে হওয়ায় তিনি তীর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলেন সূর্যকে। আর একবার শাসনের ভয় দেখিয়েছিলেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে।

পেশীতে ছিল তাঁর বজ্রের কাঠিন্য, কিন্তু অন্তর জুড়ে ছিল

সারল্যের সুরভি। অজ্ঞানে পাপ করেছিলেন, স্বেচ্ছায় স্বহস্তে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাথায় তুলে নিয়েছিলেন,—যে প্রায়শ্চিত্ত অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর, মৃত্যুপণ আত্মলাঞ্ছনা। প্রেমের জন্য আত্মদানে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না, প্রীতির জন্য জীবনোৎসর্গে তাঁর কার্পণ্য ছিল না,—বিশ্বাসের পরীক্ষায় ভয়ঙ্করতম বিপদকে তিনি বারে বারে আলিঙ্গন করেছেন। বজ্রের মতো কঠোর, কুসুমের মতো কোমল, আলোকের মতো বিশ্বস্ত, তমিস্রার মতো স্বার্থচিহ্নবিহীন ছিল তাঁর চরিত্র। এ চরিত্র আদর্শ মানুষের, এ চরিত্রের তুলনায় দেবচরিত্র কলঙ্ক-মলিন।

পিতা জুপিটার তাঁর এই শ্রেষ্ঠ মানবী-সন্তানের নাম দিয়েছিলেন হেরাক্লেস। এ নামের অর্থ হেরা বা জুনোদেবীর জয়। কথিত আছে, জুনোদেবী নাকি না জেনে একবার এই মানব-শিশুকে স্তন্যদানও করেছিলেন। কিন্তু মানবী আল্কমিনার এই সন্তানকে জুনো চিরদিন তাঁর সম্রাজ্ঞী-হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘৃণা করে এসেছেন,—এই ঘৃণা হারকিউলিসের জীবনে পদে পদে এনেছে দুরন্ত অভিশাপ।

হারকিউলিসের জন্মের সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে জুনো মতলব করলেন এই শিশুকে হত্যা করতে হবে। আল্কমিনা একসঙ্গে দুই সন্তান প্রসব করেন,—জুপিটারের ঔরসজাত হারকিউলিস আর তাঁর স্বামী অ্যাম্ফিট্রিয়নের ঔরসজাত ইফিক্লেস। তাদের জন্মের পর তখনো এক বৎসরও কাটেনি, এক রাত্রে দুটি শিশু তাদের দোলনায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুমচ্ছে—এমন সময় দুটি বিরাট সর্প এসে তাদের শয্যায় উঠল। বিশাল তাদের ফণা, জ্বলন্ত চোখ, লকলকে জিভ। এই সাপদুটি পাঠিয়েছিলেন জুনো। তাদের

হিংস্র হিস্‌হিসানি শুনে শিশুদের ঘুম ভেঙে গেল। আর্তস্বরে কেঁদে উঠল ইফিক্লেস, কিন্তু শিশু হারকিউলিস দুহাতের মুঠোয় দুই সাপের গলা টিপে ধরে মুহূর্তে তাদের বধ করল। রাজশিশুর এই অলৌকিক শক্তি-কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল,—দেশবাসী বুঝল এ শিশু সামান্য মানবশিশু নয়। থীবসের অন্ধ ভবিষ্যৎবক্তা টাইরেসিয়াস আল্কমিনাকে বললেন,—আজ থেকে যুগযুগান্ত পরেও গ্রীকমাতা তার সন্তানের কাছে তোমার এই সন্তানের কাহিনী শোনাবে। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বীর বলে চিরকাল পূজিত হবে তোমার এই পুত্র। পুত্রগর্বে ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হবে তোমারও নাম।

প্রাচীন মনুষ্যসমাজের আদর্শ পৌরুষের অধিকারী ছিলেন হারকিউলিস। দৈহিক বীর্য আর মানসিক সারল্য এই পৌরুষের অলঙ্কার অনুভূতি, বিবেচনা নয়। হারকিউলিস বিবেচক ছিলেন না, বুদ্ধিবাদী ছিলেন না,—অভিজ্ঞতার স্থৈর্য ছিল না তাঁর চরিত্রে। মুহূর্তে তিনি আগুন হতেন, আবার জল হতেও মুহূর্ত লাগত না। ক্রোধে তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হতেন এক লহমায়, আবার পরক্ষণে অনুতাপের অশ্রুজলে সেই ক্রোধ নির্বাপিত হত। অনুভূতির আলোছায়ায় বিচিত্র তাঁর বীর-চরিত্র।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর শিক্ষার কোনো ত্রুটি রাখেন নি অ্যাম্ফিট্রিয়ন,—কিন্তু ধৈর্য, অনুশীলন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিয়মিত প্রয়োগ যে শিক্ষায় প্রয়োজন,—সেই শিক্ষায় হারকিউলিসের আকর্ষণ ছিল না। সঙ্গীত শিক্ষা হারকিউলিস পছন্দ করতেন না,—কথিত আছে একদা তিনি রাগের বশে হাতের বীণাযন্ত্রটি তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষকের মাথায় ভাঙেন, সেই আঘাতে গুরুর মৃত্যু হয়। হারকিউলিসের প্রধান আকর্ষণ ছিল অস্ত্রবিদ্যার প্রতি। অ্যাম্ফিট্রিয়ন নিজে ছিলেন দুর্মদ সেনাপতি, তিনি হারকিউলিসকে রথচালনা শিক্ষা দেন।

রাজনীতি ও সৈন্যচালনা শেখান ক্যাস্টর। মার্কারির এক পুত্র তাঁকে শেখান মুষ্টিযুদ্ধ, স্বয়ং অ্যাপোলোদেবের কাছ থেকে তিনি লাভ করেন ধনুর্বিদ্যা। সর্বাস্ত্রকুশলী হারকিউলিস শুধু কেবল শ্রেষ্ঠ দেহী ছিলেন তাই নয়, কি ধনুর্বাণে কি বর্শায় তিনি ছিলেন অব্যর্থলক্ষ্য। অনাড়ম্বর জীবনে তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন, বিলাসিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। তাঁর আহার ছিল প্রচুর, কিন্তু নিছক রসনাতৃপ্তির লোভ তাঁর ছিল না। দিনশেষে তারকাখচিত মুক্ত আকাশের নিচে বিশ্রাম তাঁর প্রিয় ছিল।

আঠারো বৎসর বয়সে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হোলো, সম্পূর্ণ হোলো শারীরিক বিকাশ। পূর্ণ যৌবনের সমাগমে হারকিউলিস তাঁর বিক্রমের নূতন পরিচয় দিলেন। সিথেরন পর্বতের পার্শ্ববর্তী অরণ্যভূমিতে বিরাট এক সিংহ থাকত। তার অত্যাচারে নিকটস্থ অধিবাসীরা ভয়ে কাঁপত। একলা হারকিউলিস তার সন্ধানে বনে প্রবেশ করলেন। মাটি থেকে উপড়ে নিলেন অলিভ গাছের একটা গুড়ি। সেই গুড়ির আঘাতে সেই ভয়ঙ্কর সিংহকে বধ করলেন হারকিউলিস।

অরণ্যরাজকে বধ করে থীবস শহরে ফিরে আসছেন বিজয়পুলকিত হারকিউলিস,—পথে মিনিয়ান দূতদের সঙ্গে দেখা। অনেক বৎসর আগে থীবসবাসীরা এই মিনিয়ানদের কাছে যুদ্ধে হেরে যায় ও এক অত্যন্ত অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধির সর্ত যে, পরবর্তী কুড়ি বৎসর ধরে প্রতি বৎসর থীবসবাসীরা মিনিয়ানরাজকে একশোটি করে গাভী উপঢৌকন দেবে।

নানা অঙ্গভঙ্গী করছে আর ঢোলক বাজাচ্ছে দুর্বিনীত দূতের দল। হারকিউলিস তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তারা কর্কশ

ভাষায় উত্তর দিল যে তারা তাদের রাজার হয়ে এ বৎসরের উপঢৌকনের কথা থীবসবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছে।

হারকিউলিস শুধোলেন,—এ উপঢৌকন দিতেই হবে?

হবে বৈকি। নইলে আমাদের রাজা এসে তোমাদের সবাইয়ের নাক কেটে ছেড়ে দেবে যে!

হারকিউলিস কথা বাড়ালেন না। মৌখিক তর্ক তাঁর স্বভাবের বাইরে। দৃঢ়মুষ্টিতে এক-একজন দূতের ঘাড় চেপে ধরে তাদের প্রত্যেকের নাক আর কান কেটে ছেড়ে দিলেন তিনি। ঢোলক ফেলে আর্তস্বরে চীৎকার করতে করতে পালালো তারা।

এর উত্তর যুদ্ধ। হারকিউলিস নিলেন প্রতিরক্ষার ভার। থীবসবাসীদের তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করলেন। প্রতিটি সমর্থ পুরুষকে আহ্বান করে তিনি তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক দুর্ধর্ষ সৈন্য-বাহিনীতে রূপান্তরিত করলেন। মিনিয়ান-বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হোলো থীবস-বাহিনীর কাছে। এই যুদ্ধে তাঁর সৈন্যরা যতো না লড়ল, তার চেয়ে অনেক বেশি লড়লেন হারকিউলিস নিজেই। শত-শত মিনিয়ান যোদ্ধাকে অবলীলাক্রমে তিনি বধ করলেন এবং শত্রুরাজকে নিধন করে পরাধীনতার চরম প্রতিশোধ নিলেন।

থীবস আবার স্বাধীন হোলো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে হারকিউলিস রক্ষাকর্তা জুপিটার ও রণদেবী মিনার্ভার পূজা দিলেন। থীবসবাসীরা হারকিউলিসের এক প্রস্তর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে সম্মানিত করল। থীবসরাজ ক্রিয়ন তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা মিগারাকে।

তিন

থীবস রাজ্যে পরম সুখে আছেন রাজ-জামাতা হারকিউলিস। গৃহে

প্রীতিময়ী ভার্যা, সমগ্র প্রজার অকুণ্ঠ সম্মান-প্রসাদ। রাজ্যের তিনি পরম বিশ্বাসভাজন পরমাত্মীয়। অতিথি অ্যাম্ফিট্রিয়নের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর করেছেন রাজা ক্রিয়ন, আল্কমিনার অপর সন্তান ইফিক্লেসের সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। মিগারার গর্ভে হারকিউলিসের কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মেছে। ইতিমধ্যে মিনিয়ানদের মিত্র ইউবিয়ানরা থীবস আক্রমণ করেছে ও হারকিউলিস তাদের পরাজিত করে থীবস রাজ্যের সম্মান ও আপন খ্যাতি বর্ধিত করেছেন।

কৃষ্ণ আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জুড়ে যে চিরন্তন শ্বেত ছায়াপথ বিস্তৃত রয়েছে, সেই ছায়াপথ হোলো দেবসম্রাজ্ঞী জুনোর স্তন্যদুগ্ধরেখা। এই ছায়াপথের দিকে দৃষ্টি পড়লে নবপ্রসূতি গ্রীক নারীদের মন কেমন এক অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে, তারা নবজাত সন্তানকে বুকের কাছে টেনে নেয়। মাতৃত্বের অবমাননার সাক্ষী ঐ ছায়াপথ, সাক্ষী সন্তানের বেদনার।

হারকিউলিস তখন সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। জুনোর হিংসার ভয়ে আল্কমিনা থীবসের নগর-প্রাচীরের বাইরে প্রান্তরে শিশুকে পরিত্যাগ করে এলেন। জুপিটার মিনার্ভাদেবীকে পরামর্শ দিলেন জুনোকে সঙ্গে করে ঐ প্রান্তরে বেড়াতে যেতে। রোরুদ্যমান নবজাত শিশুর প্রতি মিনার্ভা জুনোর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেন,—দ্যাখো দ্যাখো,—কোন্ পাষাণী এমনি করে শিশুকে পরিত্যাগ করেছে! মা নয় তো, রাক্ষসী!

জুনো শিশুর পরিচয় না জেনে তাকে বুকে তুলে নিয়ে আপন বাম স্তনবৃন্তটি তার মুখে দিলেন। শিশু হারকিউলিস এমন জোরে জুনোর স্তন চুষল যে হঠাৎ-ব্যথায় জুনো শিশুকে ঠেলে সরিয়ে

দিলেন। দেবরানীর স্তন থেকে যে দুগ্ধধারা ফিন্‌কি দিয়ে বার হোলো তাতে রচিত হোলো আকাশের ঐ ছায়াপথ।

জুনো বা হেরাদেবীর স্তন্য পান করেছিলেন বলে হারকিউলিসের গ্রীক নাম 'হেরার সম্মান' বা হেরাক্লেস। দেবরাজ্ঞীর স্তনধারা স্বর্গের অমৃত। সেই অমৃত পান করেছিলেন বলেই হারকিউলিস অমরত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ স্তন্যদুগ্ধ মাতার স্নেহামৃত নয়, হিংসালোলুপ বিমাতার অনভিপ্রেত অনিচ্ছাকৃত দান।

শিশুকালে কালসর্প পাঠিয়ে জুনো হারকিউলিসকে বধ করতে পারেন নি। হারকিউলিস বড়ো হয়েছেন, প্রখ্যাত হয়েছেন, সুখ-শান্তির অধিকারী হয়েছেন,—আর সঙ্গে সঙ্গে জুনো জ্বলেছেন পুঞ্জীভূত ঈর্ষার দাহনে। এইবার তিনি তাঁর রোষবহ্নিতে দাহন করলেন হারকিউলিসের চৈতন্য। হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেলেন হারকিউলিস। এমন সাঙ্ঘাতিক উন্মাদ, যে সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রংশ হোলো তাঁর। মানুষটা হারিয়ে গেল, শুধু জেগে রইল ভীমশক্তি একটা পশু। উন্মত্ত অবস্থায় শত্রুভ্রমে তিনি আপন সন্তানদের হত্যা করলেন। প্রিয়তমা পত্নী মিগারা কনিষ্ঠ সন্তানকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামীর সম্মুখে। তিনিও পরিত্রাণ পেলেন না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। তারপরেই চৈতন্য ফিরে এল তাঁর। হারকিউলিস দেখলেন আপন প্রাসাদের প্রধান প্রকোষ্ঠে তিনি দাঁড়িয়ে, পায়ের কাছে লুটিয়ে আছে স্ত্রীপুত্রের মৃতদেহ। জায়া ও আত্মজদের রক্তে লোহিত তাঁর দুই হাত, লোহিত তাঁর বস্ত্র, রক্তাক্ত হর্ম্যতল। কী হোলো? কেমন করে ঘটল এই সর্বনাশ? একটু আগে যে তিনি কথা বলছিলেন এদের সঙ্গে! কে এদের নিষ্ঠুর হত্যাকারী?

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন হারকিউলিস, এমন সময় ভয়ে-

ভয়ে কাছে এগিয়ে এলেন অ্যাম্ফি ট্রিয়ন।

চীৎকার করে উঠলেন হারকিউলিস। একলাফে অ্যাম্ফি-ট্রিয়নের সামনে গিয়ে তাঁর দুই কাঁধ চেপে ধরলেন,—কে মারল, কে মারল? কে আমার স্ত্রীপুত্রের হত্যাকারী?

কাঁপতে কাঁপতে অ্যাম্ফি ট্রিয়ন উত্তর দিলেন,—তুমি নিজে।

আমি?

রক্তমাখা দুই হাত নিজের চোখের সামনে তুলে ধরলেন হারকিউলিস।

হ্যাঁ বাবা, তুমি। কিন্তু তখন তুমি পাগল হয়ে গিয়েছিলে।

সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ গলায় হারকিউলিস বললেন,—এই হত্যার প্রতিশোধ চাই! রক্তের বদলে রক্ত, প্রাণের বদলে প্রাণ!

প্রাসাদ ছেড়ে স্খলিত পদে পথে বার হলেন হারকিউলিস। আকাশের খররৌদ্ররাগ পাণ্ডুর হয়ে গেল তাঁর শোকমলিন দৃষ্টিতে। বৃথা তাঁর শক্তি, বৃথা তাঁর জীবন। কিছু নেই, কেউ নেই তাঁর। চারিদিকে শুধু শুষ্ক মরু, নির্জন শ্মশান। এই শ্মশানেও আশ্রয় নেই তাঁর, তাঁর আশ্রয় মৃত্যুর ক্রোড়ে। ধ্বংস হোক জীবন। পাপ! এতো বড়ো পাপ তিনি করেছেন যা কোনো মানুষ কোনো দিন করেনি। স্ত্রীকে হত্যা করেছেন, আত্মজকে হত্যা করেছেন,—যতো দিন এ পৃথিবীতে তিনি থাকবেন সারা পৃথিবী শিউরে উঠবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। কী প্রায়শ্চিত্ত এই মহাপাপের? প্রায়শ্চিত্ত আত্মহত্যা। স্টিক্স নদী পার হয়ে মৃত্যুপুরীতে তিনি যাবেন, সেখানে মৃত স্ত্রীপুত্রের প্রেতাত্মার সামনে নতজানু হয়ে বসবেন, বলবেন,—ক্ষমা করো এই সর্বস্বঘাতী পাপীকে।

পথে দেখা হোলো পরম বন্ধু থেসিউসের সঙ্গে। থেসিউস দুঃ-সংবাদ পেয়েছিলেন, ছুটে আসছিলেন বন্ধুকে ধরবার জন্যে। থেসিউস

জড়িয়ে ধরলেন হারকিউলিসকে, দুহাতে হারকিউলিসের রক্তাক্ত হাত চেপে ধরে বললেন,—কোথা যাও হারকিউলিস?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হারকিউলিস বললেন,—সরে যাও, পথ ছাড়ো।

থেসিউস বললেন,—না,—আমি ছাড়ব না তোমাকে। এই দ্যাখো তোমার হাতের রক্ত আমার হাতে আমি মাখিয়ে নিয়েছি, তোমার ভাগ্যের অংশও আমাকে নিতে হবে।

জানো, আমি কী করেছি?

জানি। এও জানি, তোমার শোক আকাশ স্পর্শ করেছে। এই শোক দেবতার অত্যাচার। এই অত্যাচার মাথা উঁচু করে মানুষই সহ্য করতে পারে। এই অত্যাচারে যে চূর্ণ হয় না, সে-ই মানুষ।

না থেসিউস, আমাকে যেতে দাও, আমাকে মরতে দাও।

পাগল? হারকিউলিসকে জড়িয়ে ধরে থেসিউস বললেন,—বীর কখনো আত্মহত্যা করে?

কী বলো? বেঁচে থাকব? পত্নীহন্তা সন্তানহন্তা,—এই পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকব?

হ্যাঁ, থাকবে। শোক দুঃখ নিন্দা এই নিয়েই বেঁচে থাকবে।

থেসিউস আরো বললেন,—আমার সঙ্গে এথেন্সে তুমি চলো। আমার কাছে তুমি থাকবে। তোমাকে আশ্রয় দিয়ে আমার রাজ্য ধন্য হবে।

থেসিউসের সঙ্গে হারকিউলিস এথেন্সে গেলেন। ভাগ্যহত বীরকে এথেন্সের প্রজারা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করল। কিন্তু হারকিউলিসের মনে শান্তি নেই। তাঁর মনে শুধু এক ভাবনা। প্রিয়হন্তা তিনি, পরম পাপী তিনি, কোথায় তাঁর প্রায়শ্চিত্ত? এই

প্রশ্ন তাঁকে দিবারাত্রি দাহন করে। এই জ্বলন্ত প্রশ্নকে বুকে নিয়ে তিনি উত্তরের প্রত্যাশায় ডেলফির মন্দিরে যাত্রা করলেন।

অ্যাপোলোদেবের জাগ্রত আসন ডেলফির মন্দিরে। এই মন্দিরের পুরোহিতের মুখ দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেন অ্যাপোলো।

দেবতার চরণে শোকজর্জর চিত্ত সমর্পণ করলেন হারকিউলিস। আর্ত কণ্ঠে পুরোহিতকে শুধোলেন,—আমার এই অভিশপ্ত জীবনের ভবিষ্যৎ কী? স্ত্রীপুত্রহন্তারক আমি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?

ডেলফির ভবিষ্যৎবাণী থেকে হারকিউলিস নির্দেশ পেলেন যে তাঁকে থীবস পরিত্যাগ করে মাইকেনি নগরে যেতে হবে। সেখানকার রাজা ইউরিস্থিউসের অধীনে দাসত্ব করতে হবে বারো বৎসর। তিনি যে কাজ দেবেন, অবনত মস্তকে নিঃশব্দে তা পালন করতে হবে বিনা সর্তে। বারো বৎসর দাসত্বের ফলে তাঁর পাপের স্খালন হবে।

হারকিউলিস মান্য করলেন এই নির্দেশ।

চার

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মাইকেনি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন পার্সিউস। মাইকেনির সিংহাসনে অধিকার ছিল অ্যাম্ফিট্রিয়নের। কিন্তু তিনি স্বরাজ্যহারা,—রাজ্যের বর্তমান অধীশ্বর কাপুরুষ ও ক্রূরমনা ইউরিস্থিউস। তাঁর কাছে দাসত্ব স্বীকার করলেন মহাবীর হারকিউলিস।

ইউরিস্থিউস কাপুরুষ হলেও নির্বোধ ছিলেন না। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নর তাঁর দাস। কী কাজ তাঁকে দিয়ে তিনি করাবেন? কোন্ রাজকার্যে তাঁকে নিয়োগ করবেন? রাজ্যের মধ্যে

এমন লোককে রাখা নিরাপদ নয়। জীবিত রাখাও নিরাপদ নয়,—যদি একদিন এই দাসত্বের প্রতিশোধ নেয়!

ইউরিস্থিউস জানতেন জুপিটারের-তনয়ের প্রতি জুনোর অনির্বাণ ঈর্ষার কথা। জুনো তাঁকে বুদ্ধি দিলেন, বললেন,—এমন এক একটা সর্বনাশা কাজের ভার দাও যাতে সে কাজ সেরে আর জীবন্ত ফিরে আসতে না পারে।

ইউরিস্থিউসের আদেশে হারকিউলিসের প্রথম কর্তব্য হোলো নিমিয়ার সিংহকে বধ করা।

মাতা ধরিত্রীর জঠরজাত হিংস্রতম দৈত্যের নাম টাইফন। জুপিটার এই ভয়ঙ্কর দৈত্যকে পরাজিত করে সিসিলির এটনা পর্বতের নিচে বন্দী করে রাখেন। সেই বন্দী দৈত্যের আক্রোশে এটনা পর্বত আগ্নেয়গিরি হয়ে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। নিমিয়ার সিংহ সেই টাইফনের বংশজাত। বজ্রের মতো দৃঢ় তার শরীর, কোনো অস্ত্র দিয়ে তাকে সংহার করা যায় না। নিমিয়া শহরের প্রান্তে ট্রিটাস পর্বতের নিচে এক পার্বত্য গুহায় সেই সিংহ বাস করে। সিংহের অত্যাচারে চারিদিকের বসতি জনমানবহীন,—সিংহের সঙ্গে সঙ্গে পর্বতসানু থেকে নিষ্ঠুর অরণ্য এগিয়ে আসছে জনপদকে গ্রাস করতে।

নিষ্প্রাণ আরণ্যভূমির মধ্য দিয়ে একাকী হাঁটতে হাঁটতে হারকিউলিস যখন সিংহের গুহার কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন সূর্য মধ্যগগনে। সিংহ তখন তার প্রভাতী শিকার সমাপ্ত করে রক্তমাখা নখদ্রংষ্টা উঁচিয়ে হেলে দুলে বিশ্রামের জন্য ফিরে আসছে। গুহার পথ আটকে হারকিউলিস মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর তীর ছুঁড়তে লাগলেন তার গায়ে। তীরগুলি সিংহের গায়ে লেগে শুধু ঠিকরে ঠিকরে পড়ে আর সিংহ নির্বিকারভাবে কাছাকাছি এগিয়ে

আসে। সিংহের অগ্রগতি যখন বন্ধ করতে পারলেন না তখন হারকিউলিস তাকে তরবারি দিয়ে আক্রমণ করলেন। সিংহের গায়ে লেগে তরবারি খান্‌-খান্‌ হয়ে ভেঙে গেল। সিংহ তার রক্তমাখা পায়ের থাবাছুটো নিরুদ্বেগে একবার চেটে নিল। তারপর প্রচণ্ড মুখ ব্যাদান করে এগিয়ে এল হারকিউলিসের দিকে। হারকিউলিসের হাতে ছিল শেষ অস্ত্র বিরাট এক গদা। হারকিউলিস সিংহের সেই বিকট হাঁ-এর উপর প্রচণ্ড গদাঘাত করলেন। গদা ভাঙল টুকরো টুকরো হয়ে। সিংহের অবশ্য মাথা ঘুরে গেল গদার সেই ভীম প্রহারে—সে ত্রস্ত হয়ে গুহার মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করল। নিরস্ত্র হারকিউলিস এবার শুধু হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সিংহের উপর। শুরু হোলো শক্তির লড়াই,—শেষ পর্যন্ত সিংহকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে ছুহাতে গলা টিপে তাকে বধ করলেন হারকিউলিস।

নিমিয়ার সিংহের বিরাট মৃতদেহটাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারকিউলিস মাইকেনিতে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সেই ভয়ঙ্কর সিংহবাহী মূর্তি দেখে রাজা ইউরিস্থিউস রাজসভা থেকে অন্তঃপুরে পলায়ন করলেন। নির্দেশ দিলেন,—নগরের মধ্যে দাস হারকিউলিসের স্থান নেই, নগরপ্রান্তে তিনি যেন পরবর্তী কর্তব্যের জন্যে অপেক্ষা করেন।

বিরাট সেই সিংহের মাথাটা কেটে নিয়ে সেটাকে শিরস্ত্রাণ করলেন হারকিউলিস,—তার দেহচর্মের ছুর্ভেগ্য বর্ম তিনি ধারণ করলেন অঙ্গে।

হারকিউলিসকে নগর-সীমানার বাইরে দূর করেও ইউরিস্থিউসের ভয় যায় না। রাজপুরীর ঠিক মাঝখানে মাটির নিচে পিতলের মোটা পাত দিয়ে একটা গুপ্ত ঘর বানালেন রাজা। হারকিউলিস যদি

কখনো নগরে ঢোকেন, তাহলে তখনই যেন তিনি তার মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিতে পারেন।

হারকিউলিসের জন্যে দুরূহতর দ্বিতীয় কর্তব্য ঘোষণা করলেন ইউরিস্থিউস। আর্গস থেকে কিছু দূরে লার্না নামক স্থানে জলাভূমিতে এক ভয়ঙ্কর জলচর সাপ আছে, সেই সাপকে হনন করতে হবে। এই সাপের নটি ফণা, তাদের মধ্যে একটি ফণা অমর। এই সাপ আবার দেবসম্রাজ্ঞীর অতি প্রিয়,—জন্ম থেকেই জুনো তাকে লালন করেছেন বোধহয় শেষ পর্যন্ত তার কবলে হারকিউলিসের জীবন-সংশয়ের উদ্দেশ্যেই। সাপের নাম হাইড্রা।

আর্গস থেকে কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রতীরে লার্না নগর প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম দিকে পন্টিনাস পর্বত। বিরাট বিরাট ঝাউগাছ পাহাড়ের গা থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত প্রসারিত। পাহাড়ের একদিক দিয়ে বয়ে গেছে নদী। এই নদীর উৎসমুখ এক গভীর পর্বত-গুহা,—দেবগণের প্রিয় অতি পবিত্র স্থান এই নদীর আরণ্য উপত্যকা।

তরুণ বন্ধু ইওলাসকে সঙ্গী করে হারকিউলিস মাইকেনি থেকে যাত্রা করলেন হাইড্রার সন্ধানে। আর্গসে পৌছে তিনি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হতে হতে নদীর ঐ উৎসমুখে এসে পৌছলেন। পাহাড়ি নদী কলস্বনা,—তন্বী তরুণীর মতো লীলাচপল। দুপাশে ঘন সবুজের জটলা। সমুদ্রের উদ্দেশে যাত্রাপথে নদী ক্রমশ বিপুলা রূপ ধারণ করেছে, হারিয়েছে গতিবেগ। সাগর-মোহানার কাছটায় স্রোতের চিহ্নমাত্র নেই। নিস্তরঙ্গ পঙ্কিল জলাভূমি, কর্দমাক্ত পল্বলদাম। পচা উদ্ভিদের দুর্গন্ধ আর নোংরা বিষাক্ত কীটপতঙ্গের জটলা। সেই জলাভূমির পাঁকের মধ্যে হাইড্রার আস্তানা।

এমনই সাজ্ঘাতিক বিষ এই হাইড্রার যে তার নিশ্বাস মৃত্যু হানে।

হারকিউলিস আর তাঁর সঙ্গী ইওলাসের পদশব্দ শোনামাত্র হাইড্রা জলাভূমির পিচ্ছিলতা থেকে হিসহিস করে এগিয়ে এল। অকুতোভয় হারকিউলিস সঙ্গে সঙ্গে তাকে আক্রমণ করলেন। গদার আঘাতে এক-একটি ফণা তিনি থেঁতলে দেন আর সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে টুটুকরো করে কেটে ফেলেন ফণাটাকে। কিন্তু হাইড্রা এক আশ্চর্য ফণি! একটি ফণা কাটার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একজোড়া করে ফণা গজিয়ে ওঠে। যতো তার ফণা কাটেন হারকিউলিস, ততো তার শক্তি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এই পরম বিষ-ধরের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন হারকিউলিস। তার ফণার শেষ নেই, তার বিষ আক্রমণের অবসান নেই।

শেষ পর্যন্ত হারকিউলিস মনে করলেন, তীক্ষ্ণ ইস্পাত যেখানে পরাজিত লোহিত উত্তাপ হয়তো সেখানে জয়ী হবে। অরণ্যবৃক্ষের ডাল কেটে তাতে আগুন লাগালেন তিনি। ইওলাসকে নির্দেশ দিলেন, একটি করে ফণা যেই তিনি কাটবেন, সঙ্গে সঙ্গে সাপের সেই কাটা গলায় জ্বলন্ত গাছের ডাল চেপে ধরতে। দগ্ধ গলায় হয়তো নূতন করে ফণা গজাতে পারবে না। হারকিউলিসের ধারণা সত্য হোলো। হাইড্রার আগুনে-পোড়া কাটা গলা থেকে নূতন ফণা জন্মানো বন্ধ হোলো। শেষ পর্যন্ত শেষ ফণাটিও হারালো সে। ফণাবিহীন অজগরের দেহটা জলাভূমিকে ভীমবেগে মন্থন করতে করতে এক সময় নিশ্চুপ হয়ে গেল। হারকিউলিস তাঁর তরবারি দিয়ে হাইড্রার দেহটি কাটলেন। তার কালো রক্ত প্রচণ্ডতম বিষ। সেই বিষরক্তে হারকিউলিস তাঁর তূণীরের তীরের ফলাগুলি চুবিয়ে নিলেন। এই তীরের ফলায় যদি দেহে সামান্যতম আঁচড়ও লাগে

তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। হাইড্রাকে ধ্বংস করে সাজ্বাতিক মারণাস্ত্রের অধিকারী হলেন হারকিউলিস।

হারকিউলিসের দাসত্বের তৃতীয় শ্রম গভীর অরণ্য থেকে ডায়ানার মন্ত্রপূত এক হরিণকে ধরে আনা। হরিণ একেই দ্রুতগামী জন্তু,—এই হরিণ আবার ক্ষিপ্রতায় সব হরিণকে হার মানায়। কেউ তাকে কখনো ধরতে পারেনি।

অস্ত্র দিয়ে এই হরিণের গায়ে আঘাত করতে মন সরল না। অরণ্যে কান্তারে পর্বতসানু আর নদীতীরে এক বৎসর ধরে হারকিউলিস এই হরিণের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ালেন,—অতিক্রম করলেন দেশ থেকে দেশান্তর। এক বৎসর নিরবচ্ছিন্ন দৌড়ের পর হরিণ শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার আর বিন্দুমাত্র চলৎশক্তি রইল না,—পরাভব মানল অনুসরণকারীর কাছে।

হারকিউলিস হরিণের সামনের ও পিছনের পা দুটি শক্ত করে বাঁধলেন, তারপর তাকে কাঁধে তুলে মাইকেনির পথে যাত্রা করলেন।

গভীর অরণ্যপথে কাঁধে হরিণ নিয়ে চলেছেন হারকিউলিস। এমন সময় হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে তাঁর দুচোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হ্রস্ব-বসনা এক অপরূপা নারীমূর্তি। ভ্রূকুটি-কুটিল রুষ্ট দৃষ্টি তাঁর চোখে, হাতে ধনুর্বাণ। দেবী ডায়ানাকে চিনতে হারকিউলিসের দেরি হোলো না, দেবী তখন ধনুতে শর যোজনা করেছেন তাঁর বুক লক্ষ্য করে।

হারকিউলিস নতজানু হয়ে ডায়ানার সম্মুখে বসে পড়লেন।

দেবী বললেন,—জানো, কী অপরাধ তুমি করেছ?

হারকিউলিস বললেন,—জানি দেবী, আপনার প্রিয় হরিণটিকে আমি বন্দী করেছি। কিন্তু দেবী, এও ঠিক, কোনো মানুষ আজ

পর্যন্ত যা করতে পারে নি, সেই অসাধ্য আমি সাধন করেছি।

হারকিউলিস ডায়ানাকে বুঝিয়ে বললেন যে দেবীর প্রতি কোনো অসম্মান প্রদর্শন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ভাগ্যনির্দেশে তিনি ইউরিস্থিউসের দাস। ইউরিস্থিউসের আদেশেই তিনি এই হরিণকে ধরেছেন। একবার সেই হরিণকে প্রভুর চোখের সামনে তাঁকে নিয়ে যেতেই হবে, তারপর আবার তাকে মুক্তি দেবেন। অন্যথা হবে না।

প্রসন্না হলেন দেবী ডায়ানা।

বিশ্রামের অবসর নেই। তৃতীয় শ্রম সম্পূর্ণ করে রাজধানীতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ইউরিস্থিউস ঘোষণা করলেন তাঁর চতুর্থ কর্তব্য। হেঁকে বললেন,—

ইরিম্যান্থাসের পার্বত্য অঞ্চলে একটা বরাহ এসে বড়ো গোলমাল বাধিয়েছে। যাও, বরাহটাকে ধরে নিয়ে এস।

অক্লান্ত বীর হারকিউলিস মাইকেনির নগর-প্রান্ত থেকে আবার পথে বার হলেন।

ইরিম্যান্থাস পর্বতে যাবার পথে হারকিউলিস অশ্ব-মানব সেণ্টরদের রাজ্যে উপস্থিত হলেন। ফোলাস নামে এক সেণ্টর তাঁকে আমন্ত্রণ করল। কিন্তু অন্য সেণ্টররা হারকিউলিসকে মোটেই সুচক্ষে দেখল না। ফোলাসের আতিথেয়তাতে তারা প্রতিবাদ করল ও একযোগে হারকিউলিসকে আক্রমণ করতে এল। তুমুল যুদ্ধে একাকী হারকিউলিস সেণ্টরদলকে পরাজিত করলেন। বহু সেণ্টর মারা পড়ল তাঁর গদার তাড়নায়, আরো বহু মারা পড়ল তাঁর বিষাক্ত শরাঘাতে।

এই সেণ্টরদের দলপতি ছিলেন কাইরন। কাইরন ছিলেন মহা পণ্ডিত ও সত্যদ্রষ্টা। জুপিটারের বরে তিনি ছিলেন অমর।

হারকিউলিসের প্রহারে জর্জরিত হয়ে অনেক সেণ্টর প্রাণভয়ে কাইরনের গুহায় আশ্রয় নিল। তাদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হারকিউলিসের একটি তীর কাইরনের হাঁটুতে গিয়ে বিঁধল। এই তীরের মুখে হাইড্রার মারাত্মক বিষ। ক্ষতের যন্ত্রণায় চীৎকার করতে লাগলেন কাইরন। অনুতপ্ত হারকিউলিস ধনুর্বাণ ত্যাগ করে আর্ত কাইরনকে জড়িয়ে ধরলেন।

কোনো প্রতিষেধকে এই ক্ষতের যন্ত্রণা প্রশমিত হবার নয়। কিন্তু কাইরন অমর। তাঁর মৃত্যু নেই, হাইড্রার বিষ ক্ষতমুখে তাঁর সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়ে গেল। অনির্বাণ যন্ত্রণায় জ্বলতে লাগল তাঁর প্রতি অঙ্গ।

জেসনের মতো কিশোর হারকিউলিসও কাইরনের কাছে বহু বিদ্যা লাভ করেছিলেন। গুরুর অঙ্গে অনিচ্ছাকৃত আঘাত হারকিউলিস হেনেছেন, আচ্ছন্ন করেছেন গুরুকে মৃত্যুহীন মৃত্যু-যন্ত্রণায়। মর্মাহত হারকিউলিস নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেণ্টরদের ভূমি পরিত্যাগ করে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হলেন।

শীতকাল এসে গেল। পাহাড়শ্রেণীর মাথায় তুষার, তুষার বন্ধুর পার্বত্য পথে। বিকট বরাহটার সাক্ষাৎ পেয়েছেন হার-কিউলিস। জীবন্ত ধরতে হবে, তাই জন্তুটার পিছনে দৌড়চ্ছেন মাসের পর মাস। বরাহ ক্লান্ত হয়ে পড়ল শেষ পর্যন্ত, তুষারে ডুবে ডুবে যেতে লাগল তার ক্লান্ত পা। হারকিউলিস শেষ পর্যন্ত ধরলেন বরাহটাকে, তার ভয়াল চোয়ালদুটো শক্ত মুষ্টিতে চেপে ধরে প্রচণ্ড জোরে তার ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিলেন। বরফঢাকা কঠিন পার্বত্য ভূমিতে আছড়ে পড়ল তার বিরাট দেহ। তারপর সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে বীর ফিরে চললেন রাজধানীর পথে।

ইউরিস্থিউস সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ার আর তার ভয়ঙ্করতর

শিকারীর মূর্তি দেখে আতঙ্কবিহ্বল হয়ে সোজা আশ্রয় নিলেন তাঁর ভূগর্ভ-কোটরে। দুদিন আর বার হলেন না সেই ধাতব আশ্রয় থেকে,—একলা বসে বসে শুধু ঠকঠক করে কাঁপলেন।

পাঁচ

ইলিস নগরের রাজা অগিয়াস। গো-সম্পদে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। গোরু মহিষ ভেড়া ছাগল তাঁর যতো ছিল, সারা পৃথিবীতে আর কারো তা ছিল না। বিরাট তার গোশালা, তাতে শুধু ষাঁড়ই ছিল তিন হাজারের বেশি। এদের মধ্যে তিনশোটি ষাঁড় ছিল কালো কুচকুচে, দুশোটি ষাঁড় ছিল লাল টকটকে, আর শ্রেষ্ঠ বারোটি ষাঁড়ের গায়ের রঙ ছিল রুপোর মতো ঝকঝকে।

গত দশ বছর ধরে অগিয়াসের বিরাট গোশালার আবর্জনা কেউ পরিষ্কার করে নি। পাহাড়-প্রমাণ বিষ্ঠা, সর্বত্র পাথরের মতো শক্ত হয়ে রয়েছে,—চারিদিক মূত্রকর্দমে পিচ্ছিল। এমন বিকট দুর্গন্ধ, যে কাছে এগোয় কার সাধ্য! এমনকি গোপালকদের পক্ষেও দুঃসাধ্য। অগিয়াসের গোশালার কদর্যতা ও দুর্গন্ধের কুখ্যাতি সারা গ্রীস দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

পর পর চারটি বীরত্বের কাজ দিয়েও ইউরিস্থিউস হারকিউলিসকে পরাজিত করতে পারেন নি। হিংস্রতম সিংহ সর্প বরাহ পরাজিত হয়েছে তাঁর অকুতোভয় শক্তির কাছে। এইবার ইউরিস্থিউস ভাবলেন,—আতঙ্কের সমুদ্র অতিক্রম করতে পারলেও ঘৃণার পাহাড়ের কাছে তাঁর দাস পরাস্ত হবেই। তিনি হারকিউলিসকে ইলিস নগরে পাঠালেন,—হুকুম দিলেন রাজা অগিয়াসের ঐ গোশালা এক দিনের মধ্যে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

হারকিউলিসের কথা শুনে রাজা অগিয়াস তো হেসেই খুন!

এই যোজনব্যাপী নোংরার রাজ্যকে একদিনে মুক্ত করবে তুমি? এ কি মানুষের সাধ্য? সাধ্য হলে বছরের পর বছর ধরে নোংরার পাহাড় জমতে দেয় কেউ? আর একটি পা এগিয়ো না। দশ বছর ধরে যেমন আছে তেমনি থাক। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

হারকিউলিস বললেন,—রাজা, এ আমার দাসত্বের ব্রত। শুধু একটি দিন আমাকে সময় দিন, একটি সকাল থেকে একটি সন্ধ্যা।

এক কেন, সহস্র দিনেও তুমি পারবে না,—সরে পড়ো।

যদি পারি?

যদি পারো তাহলে সহস্র গাভী তোমাকে দেব।

ইলিস শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দুই বেগবতী নদী,—ছুটেছে তারা আইয়োনিয়ান সমুদ্রের উদ্দেশে। নাম তাদের আলফিউস আর পিনিউস। গোশালার পাথরের পুরু প্রাচীরের দুই স্থানে দুটি ফাটল ধরালেন হারকিউলিস। তারপর ঐ দুই নদীর স্রোতোধারাকে পরিবর্তিত করে ঐ দুই ফাটলের মধ্য দিয়ে বহিয়ে দিলেন। ক্ষুরধার স্রোত গোশালার মধ্য দিয়ে ছুটে চলল, প্রচণ্ড বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল গোশালার সমস্ত আবর্জনা।

এক দিনের মধ্যে অগিয়াসের গোশালা পরিষ্কার করলেন হারকিউলিস। কিন্তু রাজা অগিয়াস তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন না। বললেন,—ইউরিস্থিউসের আদেশেই তো আমার গোশালা পরিষ্কার করেছ,—এজন্যে আবার তোমাকে গাভী উপহার দেব কেন হে?

মাইকেনিতে ফিরে গেলেন হারকিউলিস। ক্রূর ইউরিস্থিউস শুনে বললেন,—তুমি আর কী করেছ? নদীই তো যা করবার তাই করেছে। তোমার কৃতিত্ব কী?

হারকিউলিসের ষষ্ঠ কর্তব্য হোলো স্টিম্ফালিয়ন হ্রদের মাংসভুক পক্ষীদের হত্যা করা। এই পাখিগুলি সারসের মতো দেখতে,—যদিও

চেহারায় সারসের দশ-বিশ গুণ বড়ো। তাদের নখ আর চঞ্চু পিতল দিয়ে তৈরি, গায়ে পিতলের পালক। স্টিম্ফালিয়ন হ্রদের অগভীর জল পঙ্বলদামে পূর্ণ। চারদিকে ঝোপঝাড়,—কণ্ঠকগুল্মে ঘেরা বন্ধুর পার্বত্য ভূমি। হ্রদের ধারে ধারে আর আশেপাশে পাথরের খাঁজে খাঁজে এইসব পাখিরা হাজারে হাজারে বাস করে। মাঝে মাঝে দল বেঁধে আকাশ কালো করে জনপদে উড়ে যায়। মাংসাশী তারা, মানুষের মাংস তাদের প্রিয়। তাদের বিষ্ঠা মহাবিষ। যে শস্যক্ষেত্রে তারা বিষবিষ্ঠা ছড়ায়, সেই ক্ষেত্রে আর ফসল জন্মায় না কখনো।

হারকিউলিসের কাজ হোলো এই অসংখ্য পক্ষিকুলকে নির্বংশ করা। কিন্তু কেমন করে করবেন তিনি? হ্রদের পাশে পাশে তিনি ঘুরে বেড়ালেন,—কিন্তু পাখিদের নাগাল তিনি পাবেন কী করে?

মিনার্ভা দেবী হারকিউলিসকে সাহায্য করলেন। তিনি তাঁকে দিলেন ধাতুনির্মিত এক আশ্চর্য ঝুমঝুমি। মহা কর্কশ ভয়-পাওয়ানো তার শব্দ। সেই ঝুমঝুমির বিকট আওয়াজ শুনে ভয়-চকিত পাখিগুলো ডানা ঝটপটিয়ে আকাশে উড়তে লাগল, আর অব্যর্থ-লক্ষ্য হারকিউলিস তীর মেরে তাদের ভূপাতিত করতে লাগলেন।

এইভাবে তিনি এই বীভৎস পক্ষিকুলকে নির্মূল করলেন।

·

সপ্তম কর্তব্য সম্পাদন করতে হারকিউলিসকে যেতে হোলো সমুদ্রপারে। মূল গ্রীসভূমির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী ক্রীট দ্বীপে। সেখানে দৈত্যবংশসম্ভূত এক ভয়ানক ষণ্ড সারা দেশ ছারখার করছিল।

ক্রীটের রাজা মাইনস হারকিউলিসকে সমাদরে স্বরাজ্যে অভ্যর্থনা করলেন ও তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে অগ্রসর

হলেন। কিন্তু রাজার সহায়তা প্রত্যাখ্যান করলেন হারকিউলিস। একা হাতে তিনি এই প্রচণ্ড ষণ্ডকে জয় করলেন।

দক্ষিণ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরিস্থিউস হারকিউলিসকে হুকুম দিলেন,—যাও, উত্তরে যাও!

ঈজিয়ান সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে থ্রেস রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা ডায়োমিডিস যুদ্ধদেব মার্সের পুত্র। ডায়োমিডিসের চারটি ঘোড়া ছিল। প্রচণ্ড শক্তিশালী তারা। ডায়োমিডিস তাদের লোহার শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখতেন। নরমাংস ছিল তাদের খাদ্য। ডায়োমিডিস তাঁর দেব-পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন নৃশংসতা। বিদেশী অতিথিদের তিনি প্রাসাদে আহ্বান করে এনে নির্দয়ভাবে হত্যা করতেন,—তারপর তাদের মাংস দিয়ে তাঁর প্রিয় ঘোটক-চতুষ্টয়ের পেট ভরাতেন।

হারকিউলিস কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে থ্রেস দেশে পৌঁছলেন ও ডায়োমিডিসের অশ্বশালার দ্বার ভেঙে ফেললেন। শিকল-সমেত অশ্বগুলিকে সবলে হরণ করে সমুদ্রতীরে বেঁধে রাখলেন হারকিউলিস। তারপর হারকিউলিস ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে ডায়োমিডিস ও তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ আরম্ভ হোলো। থ্রেস সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে হারকিউলিস নিষ্ঠুর রাজা ডায়োমিডিসকে বধ করলেন। রাজার মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে সেই মাংসে রাজারই অশ্বদের পেট ভরালেন তিনি। তারপর জয়গৌরবে প্রত্যাবর্তন করলেন স্বদেশে।

ডায়োমিডিসের অশ্বদল দেখে ইউরিস্থিউস তো ভয়ে অজ্ঞান। তিনি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে হারকিউলিসকে বললেন,—নিয়ে যাও ওগুলোকে আমার সামনে থেকে। এ রাজ্য থেকে

একেবারে নিয়ে যাও। অলিম্পাস পাহাড়ের কাছে ছেড়ে দিয়ে এস। ইচ্ছে হয় জুপিটার ওদের নেবেন।

পার্বত্য অরণ্যের হিংস্র শ্বাপদের হাতে শেষ পর্যন্ত ঘোড়াগুলি প্রাণ হারালো।

সম্পূর্ণ হোলো হারকিউলিসের অষ্টম কর্তব্য।

ছয়

কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে থার্মোডন নদীর অববাহিকায় অ্যামাজন জাতির বাস। অঞ্চলটি ঘিরে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর পাহারা। পার্বত্য প্রাচীরের অন্তরালে এক আশ্চর্য জাতি আর এক আশ্চর্য সংস্কৃতি বহু শতাব্দী ধরে পোষিত হয়েছে।

এই অ্যামাজন জাতির পূর্বপুরুষ রণদেবতা মার্স। এই জাতির আদিম রানীর নাম লিসিপি। লিসিপি অ্যামাজনদের মধ্যে মাতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যামাজনরা পিতাকে মানে না, মাতৃ-নামে সন্তানের পরিচয়। পুরুষরা পরাজিত,—তারা ঘরের কোণে থাকে, নারীর দাসত্ব করে। নারী করে রাজত্ব, নারী করে যুদ্ধ। যুদ্ধের নামে অ্যামাজনরা পাগল। এই নারীদের দেহে যেমন শক্তি, মনে তেমনি হিংস্র সাহস। অ্যামাজন বীরাঙ্গনাদের অঙ্গে বন্য পশুদের ছালের পোশাক, মাথায় চামড়ার শিরস্ত্রাণ, হাতে ধনুর্বাণ ও অর্ধচক্রাকার ঢাল। পৃথিবীর প্রথম অশ্বারোহী সৈন্য এই অ্যামাজনরা। রানী লিসিপির মৃত্যুর পর অ্যামাজনরা সমগ্র এশিয়া মাইনরে প্রভুত্ব বিস্তার করে, ইফিসাস, স্মার্না প্রভৃতি এশিয়া মাইনরের বিখ্যাত নগরের প্রতিষ্ঠা করে তারা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ট্রয় নগরও একবার তাদের দ্বারা আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত হয়। ঈজিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে

এমন কোনো জাতি নেই যারা এই দুর্ধর্ষ নারীজাতির প্রতাপকে ভয় করে না।

এহেন অ্যামাজনদের রানী হিপোলিটার কোমরের অলঙ্কারটি খসিয়ে আনতে হবে,—এই হোলো হারকিউলিসের প্রতি ইউরিস্থিউসের নবম নির্দেশ।

রণতরী সাজিয়ে একদল বীর স্বেচ্ছাসঙ্গী সমভিব্যাহারে হারকিউলিস ঈজিয়ান সাগরে ভাসলেন। এই অভিযানে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আইওলাস, ইজিনার রাজপুত্র সুহৃদ টেলামন এবং প্রিয় বন্ধু থেসিউস।

সমুদ্রযাত্রার পথে হারকিউলিস পানীয় জল সংগ্রহের জন্য প্যারস দ্বীপে অবতরণ করলেন। ক্রীটের রাজা মাইনসের চার পুত্র এই প্যারস দ্বীপে অবস্থান করছিল। সম্প্রতি হারকিউলিস ক্রীট দ্বীপে গিয়ে সেখানকার ষণ্ডকে জয় করে ফিরেছেন। তাঁর বীরত্বকাহিনীতে ক্রীট দ্বীপ মুখরিত। হিংসায় জর্জরিত রাজপুত্রদের হৃদয়। তারা দেখল হারকিউলিসকে বিপর্যস্ত করার এই সুযোগ। প্যারস দ্বীপবাসীদের তারা হারকিউলিসের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিল। হারকিউলিসের দুজন সঙ্গী জল সংগ্রহ করতে দ্বীপে নেমেছিল, কুটিল রাজপুত্ররা নৃশংসভাবে হত্যা করল তাদের।

ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন হারকিউলিস। তিনি ক্রীটের রাজপুত্রদের সম্মুখীন হলেন। অবলীলাক্রমে তাদের একে একে বধ করলেন, তারপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্যারসবাসীদের উপর। প্যারসবাসীরা সভয়ে সন্ধি প্রার্থনা করল,—তাঁর দুই মৃত সঙ্গীর বিনিময়ে যে কোনো দুজনকে হারকিউলিসের দাসরূপে উপঢৌকন দিতে চাইল। প্যারসের দুই রাজপুত্রকে হারকিউলিস তাঁর সঙ্গী নির্বাচন করে জাহাজে উঠিয়ে নিলেন।

হেলিস্পণ্ট ও বসফরাস প্রণালী পার হয়ে হারকিউলিসের পোতশ্রেণী কৃষ্ণসাগরে উপস্থিত হোলো। সেখানে ট্যাণ্টালাসের পৌত্র মাইসিয়া-রাজ লাইকাসের আতিথ্য গ্রহণ করলেন হারকিউলিস। অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি করলেন না লাইকাস। হারকিউলিসও লাইকাসকে রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করলেন। তাঁর সম্মানার্থে কৃষ্ণসাগরতীরে নব-বিস্তৃত রাজ্যে এক নগর প্রতিষ্ঠা করলেন লাইকাস,—এই নগরের নাম দিলেন হেরাক্লিয়া।

অ্যামাজন রাজ্যে এসে পৌঁছলেন হারকিউলিস। এই রাজ্যের তিন রানী,—হিপোলিটা, মিলানিপা ও আণ্টিয়োপি। প্রধানা রানী হিপোলিটা, যাঁর অঙ্গের অলঙ্কার হারকিউলিসের চাই।

থার্মোডন নদীর মোহানায় অ্যামাজন রাজ্যের প্রধান বন্দরে হারকিউলিসের জাহাজ নোঙর ফেলল। তাঁর এই অভিযানের কাহিনী পূর্বাহ্নেই প্রচারিত হয়েছিল দেশে দেশে। বীর অভিযাত্রীর প্রতীক্ষায় উৎসুক হয়ে ছিলেন বীরাঙ্গনা রানী হিপোলিটা। এখন হারকিউলিসের সুন্দর ও বলিষ্ঠ কান্তি দেখে তিনি বিমুগ্ধ হলেন। বিদেশী আগন্তুককে সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন আপন প্রাসাদে।

বিদেশিনীর প্রীতিপূর্ণ পরিচর্যায় পরিতৃপ্ত হলেন হারকিউলিস। তারপর শুধোলেন,—তোমার এই রাজ্যে কেন আমি এসেছি তা জানো রানী?

রানী হিপোলিটার বঙ্কিম তনুকেন্দ্রে ক্ষীণ কটিতটে উজ্জ্বল মাণিক্যখচিত অপূর্ব সুবর্ণ-মেখলা। মৃদু হেসে তিনি বললেন,—জানি।

হিপোলিটার কটিদেশে বাহু স্পর্শ করে হারকিউলিস বললেন,—তোমার এই মেখলাটি আমার চাই।

পাষাণহৃদয়া অ্যামাজন রানীর অন্তরে প্রেমফল্গু। হৃদয়ের শিরায় শিরায় রক্তের বিচিত্র উদ্বেলন। হারকিউলিসের ডান হাতটি নিজের দুই হাতে ভরে নিলেন হিপোলিটা।

বিদেশী বীর, শুধু এই নিষ্প্রাণ মেখলাটির জন্যেই কী তুমি সমুদ্র পর্বত অতিক্রম করে এসেছ? মেখলাটি নেবে বৈকি। কিন্তু যার এই মেখলা, তাকে তুমি নেবে না?

ভাগ্যতাড়িত ক্লান্ত হারকিউলিসের মনে হোলো, সত্যিই তাঁর তরণী বুঝি এতোদিনে শান্ত শ্যামল তীরের আশ্রয় পেয়েছে।

সকলের অলক্ষ্যে হারকিউলিসের ভাগ্যের উপর দেবরানী জুনোর ছিল অপলক শ্যেনদৃষ্টি। সেই দৃষ্টির হলাহলকে এড়াবার সাধ্য কোথায় দুর্ভাগা হারকিউলিসের? অ্যামাজন নারীর ছদ্মবেশে জুনো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রাজধানীর পথে পথে। প্রচার করতে লাগলেন,—ঐ বিদেশী গ্রীকের মতলব ভালো নয়,—রানী হিপোলিটার সম্ভ্রম নষ্ট করে তাঁকে সবলে হরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ও এসেছে। সাবধান, সাবধান!

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল অ্যামাজন নারীবাহিনী। মার্ মার্ শব্দ করে তারা বন্দরস্থিত হারকিউলিসের জাহাজ আক্রমণ করল।

হারকিউলিসের কানে সেই রণহুঙ্কার পৌঁছলো। এ কী বিশ্বাসঘাতকতা! সর্বসমর্পিতা হিপোলিটার প্রেমায়ত চোখে তাঁর বিভ্রান্ত দৃষ্টি শুধু কুটিল বঞ্চনার ছায়াই দেখতে পেল। এক মুহূর্ত সময় নেই দ্বিধা করবার—বিচার করবার! ওদিকে তাঁর জাহাজে বুঝি আগুন লাগিয়েছে বিশ্বাসঘাতিনী রানীর ক্ষিপ্তা অনুচরীরা! কোমর থেকে ছুরিকা বার করলেন হারকিউলিস, মুহূর্তমধ্যে সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করল নিরপরাধা হিপোলিটার হৃদয়।

মৃত্যুকাতর নারীদেহ থেকে হারকিউলিস ছিনিয়ে নিলেন স্বর্ণ-মেখলা। তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন যুদ্ধের সমুদ্রে। অ্যামা-

জনদের প্রত্যেকটি রণনেত্রীকে তিনি বধ করলেন স্বহস্তে—হত্যার তাণ্ডবলীলায় মেতে উঠল তাঁর সঙ্গীরা। সঙ্গী থেসিউস অন্যতমা রানী আন্টিয়োপিকে বন্দিনী করে জাহাজে নিয়ে তুললেন।

অ্যামাজনদের রাজ্য থেকে সমুদ্রপথে প্রত্যাবর্তনের সময় হারকিউলিস স্থির করলেন সুপ্রসিদ্ধ ট্রয় নগর হয়ে যাবেন।

ঈজিয়ান সমুদ্র ও মার্মারা সমুদ্রকে সংযুক্ত করেছে হেলিস্পণ্ট প্রণালী। এই হেলিস্পণ্ট প্রণালীর পশ্চিম মুখে ঈজিয়ান সমুদ্র-তীরে ট্রয় নগরের অবস্থান। রাজ্যের বামপার্শ্ব দিয়ে পূতস্রোত স্ক্যামাণ্ডার নদ প্রবাহিত। ট্রস নামক এক ক্রীট রাজপুত্র এই ট্রয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র ইলাস নগরীর চারিদিকে রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁরই নামে ট্রয়ের অপর নাম ইলিয়াম।

ট্রয় নগরীর চারিধারে অক্ষয় অলঙ্ঘ্য অভেদ্য প্রাচীর। এই প্রাচীর নির্মিত হয় ট্রসের পৌত্র লাওমেডনের রাজত্বকালে। একবার জুপিটারের শাপে অ্যাপোলো ও নেপচুন মর্তবাসীর দাসত্ব করতে বাধ্য হন। তাঁরা ট্রয়রাজ লাওমেডনের দাসত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁর নির্দেশে ট্রয়ের প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রাচীর সম্পূর্ণ হবার পর লাওমেডন তাঁর এই দেবভৃত্যদের পূর্বস্বীকৃত পুরস্কার দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল পেতে তাঁর দেরি হয় না। সমুদ্রদেব নেপচুন প্রতি বৎসর এক বিরাট সমুদ্র-দানবকে ট্রয়ের সমুদ্রতীরে পাঠান। প্রতি বৎসর এক-একটি সুন্দরী যুবতীকে এই দানব ভক্ষণ করে যায়।

ট্রয় নগরের তীরে জাহাজ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল হারকিউলিসের। এক পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে বিবসনা এক সুন্দরী নারী, অঙ্গে তার শৃঙ্খলের অলঙ্কার। এই নারী রাজকুমারী হেসিয়নি,—সমুদ্র-দানবের এ বৎসরের পূজার বলি।

বন্দিনীর শৃঙ্খলভার মোচন করলেন হারকিউলিস। তারপর রাজপুরীতে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব করলেন, আগন্তুক সমুদ্র-দানবের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করবেন। যদি এই দানবকে হত্যা করতে পারেন, তাহলে নেপচুনের অভিশাপ থেকে চিরদিনের মতো ট্রয় রক্ষা পাবে। বিনিময়ে তিনি শুধু রাজার অশ্বশালা থেকে তুটি চমৎকার শাদা রঙের ঘোটকী পুরস্কার চাইলেন। আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন লাওমেডন।

অবলীলাক্রমে সমুদ্র-দানবকে ধ্বংস করলেন বীরকেশরী হারকিউলিস। কিন্তু চতুর রাজা লাওমেডন এবারও তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন না। প্রয়োজন সিদ্ধ হবার পর হারকিউলিসকে হাঁকিয়ে দিলেন তিনি। হারকিউলিস মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন,—এই শঠতার উপযুক্ত প্রতিশোধ তিনি নেবেন। স্বদেশে ফিরে হারকিউলিস হিপোলিটার মেখলা সমর্পণ করলেন রাজা ইউরিস্থিউসের হাতে। তাঁর নবম কর্তব্য সম্পূর্ণ হোলো।

কয়েক বৎসর পরের কথা। হারকিউলিসের দাসত্ব তখন শেষ হয়েছে। গ্রীসের বীর সুহৃদদের একসঙ্গে জড়ো করে অর্ণবপোত সাজিয়ে হারকিউলিস যাত্রা করলেন ট্রয় রাজ্যের উদ্দেশ্যে। লাওমেডনের অপমানের জ্বালা এতোদিন তাঁর মনের সঙ্গোপনে জ্বলছিল,—সেই জ্বালা মেটাবার সময় এসেছে এইবার।

হারকিউলিস ও তাঁর গ্রীক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের জন্যে ট্রয়ের রাজা লাওমেডন প্রস্তুত ছিলেন না। হারকিউলিস ও তাঁর বন্ধু টেলামন ট্রয়ের প্রাচীরের এক অংশ ভেঙে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর সৈন্যদের আক্রমণে অসতর্ক ট্রোজান সৈন্যরা পর্যুদস্ত হোলো। লাওমেডন ও তাঁর সন্তানদের হারকিউলিস হত্যা করলেন,—কেবল পার পেলো কনিষ্ঠ পুত্র প্রায়াম।

প্রায়ামকে সিংহাসনে বসিয়ে হারকিউলিস ট্রয় নগর পরিত্যাগে উদ্যত হলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হোলো এই শত্রুতার মূল কারণের কথা। হেসিয়নি কোথায়? কোথায় লাওমেডনের সেই কন্যা যাকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন? হেসিয়নিকে তিনি বন্ধু টেলামনের হাতে সমর্পণ করলেন। এই হেসিয়নির গর্ভে টেলামনের পুত্র টিউসারের জন্ম হয়।

দশম কর্তব্য সম্পাদন করতে হারকিউলিসকে যেতে হোলো পরিচিত পৃথিবীর পশ্চিম সীমান্তে,—সীমান্ত-সমুদ্রে অবস্থিত ইরিথিয়া নামক এক দ্বীপে। এই দ্বীপে বাস করত টাইটান বংশোদ্ভূত এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস,—তার চেয়ে শক্তিশালী জীব নাকি তখন আর কেউ ছিল না। রাক্ষসের নাম গেরিয়ন,—কোমরের উপর থেকে তার তিনটি দেহ,—তিন মাথা আর ছয় হাত। গেরিয়নের ছিল একপাল সুন্দর গাভী,—এই গাভীদের সর্বদা পাহারা দিত গেরিয়নের এক ভয়ঙ্কর দু-মাথাওয়ালা কুকুর,—নাম অর্থ্রাস। ইউরিস্থিউস হুকুম দিলেন, গেরিয়ন রাক্ষসকে বধ করে হারকিউলিসকে তার গাভীগুলিকে জয় করে আনতে হবে।

ভূমধ্যসাগরের তীর ধরে ধরে আবার শুরু হোলো হারকিউলিসের ক্লান্তিহীন অভিযান। পথে বহু হিংস্র শ্বাপদ ও নিষ্ঠুর দস্যুকে পরাস্ত করে করে তিনি এগিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এসে পৌঁছলেন ভূমধ্যসাগর ও অতলান্ত সাগরের সঙ্গমস্থলে। দুই সাগরের মাঝখানে একটি প্রণালী, যার বর্তমান নাম জিব্রালটার। উত্তরে ইউরোপ, দক্ষিণে আফ্রিকা। এই প্রণালীর দুই প্রান্তে হারকিউলিস দুটি স্তম্ভ নির্মাণ করলেন।

কতো পাহাড় আর মরুভূমি পার হয়ে তিনি সমুদ্রসঙ্গমে এসে পৌঁছেছেন। এখন সামনে শুধু উত্তাল সাগর, পায়ের নিচে

ধূ-ধূ বালুকা। ক্লান্ত দৃষ্টিতে মরীচিকা, আর সমস্ত বক্ষ জুড়ে তৃষ্ণা। মাথার উপর সূর্যের অগ্নিক্ষরা দাহ। তাপদগ্ধ হারকিউলিসের দেহমন একটুখানি শ্যাম ছায়ার সন্ধানী। কিন্তু এই সমুদ্র আর মরুভূমির রাজ্যে কোথায় ছায়া ? ক্রোধে অন্ধ হয়ে হারকিউলিস আকাশের সূর্যের দিকে তাঁর ধনুর্বাণ তুললেন। যুদ্ধ করবেন তিনি অ্যাপোলো-দেবের সঙ্গে।

অ্যাপোলো নিরস্ত করলেন হারকিউলিসকে। বললেন,—পাগলামি কোরো না। এস, আমি তোমাকে সাহায্য করছি।

অ্যাপোলোদেব হারকিউলিসকে দিলেন এক মন্ত্রপূত সুবর্ণ তরণী। সেই তরণীতে চড়ে হারকিউলিস অক্লেশে সমুদ্র পার হয়ে ইরিথিয়া দ্বীপে উত্তীর্ণ হলেন।

গেরিয়ন রাক্ষসের দুই-মাথাওয়ালা কুকুর ও অন্যান্য রক্ষকদের বধ করতে হারকিউলিসের দেরি হোলো না। কিন্তু আসল রাক্ষসকে পরাস্ত করা সহজ কথা নয়। দিনের পর দিন দুজনে লড়াই চলল,—লড়াই তাঁর একজনের সঙ্গে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনজনের সঙ্গে। রাক্ষসের একটা দেহকে যখন কাবু করেন, তখন অন্য দুটো দেহ বাকি থাকে। একে একে রাক্ষসের তিনটি মাথা হারকিউলিস গদাঘাতে ভাঙলেন, বধ করলেন তিনটি দেহ। তারপর তিনি সেই রাক্ষসের গাভীর পালকে সমুদ্র পাহাড় নদীপ্রান্তরের উপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চললেন স্পেন থেকে গ্রীসে। পথিমধ্যে নানাস্থানে দস্যু ও দৈত্যরা বারে বারে তাঁর হাত থেকে গাভীগুলি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। প্রতিবারই হারকিউলিস বিজয়ী হলেন ও দুরন্ত রাক্ষসদের চরম শাস্তি দিলেন।

সাত

ইউরিস্থিউসের একাদশ নির্দেশ পালন করতে হারকিউলিসকে

পুনরায় যেতে হোলো পশ্চিম সীমান্তে,—সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সূর্যের সপ্তাশ্ব তাদের দিনের কর্তব্য সম্পাদন করে বিশ্রাম করে। সেখানে সৃষ্টিকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাটলাস। অ্যাটলাসের রাজত্বে পর্বতসানুর উর্বর উপত্যকায় তাঁর হাজার হাজার গো-মহিষ ছাগ ও মেষের পাল আনন্দে চরে বেড়ায়। জুপিটারের সঙ্গে জুনোর বিবাহ উপলক্ষে মাতা ধরিত্রী নবপরিণীতাকে এক সোনার আপেলগাছ দিয়েছিলেন। সেই গাছ জুনো পুঁতেছিলেন অ্যাটলাসের উর্বর উদ্যানে। অ্যাটলাসের উদ্যানে এখন গাছে গাছে সোনার আপেল।

অ্যাটলাসের তিন কন্যা। সন্ধ্যাতারা হেসপিরিস তাদের জননী। সন্ধ্যাতারার এই তিন কন্যার নাম হেসপিরাইডিস। দিবাবসানে সূর্যদেব যখন পশ্চিম সমুদ্রের চক্রবালে অস্ত যান তখন গোধূলি-গগনে সবুজ হলুদ আর লাল রঙের বিচিত্র বর্ণালি। সুপক্কফলভারানত আপেলগাছের বর্ণসমারোহ যেন সান্ধ্য নভের লীলার সঙ্গে মিলে যায়। প্রদোষ-আকাশের ঐ রং হেসপিরাইডিস কন্যাদের ওষ্ঠে গণ্ডে আর আঁখিপল্লবছায়ায়। সন্ধ্যাতারা যখন ওঠে তখন তারা গুন-গুন গান গাইতে গাইতে উদ্যানে আসে,—সারারাত জুনোর আপেলগাছ পাহারা দেয়। সেই সঙ্গে নিরন্তর পাহারা দেয় জুনোর বশংবদ টাইফনপুত্র এক ড্রাগন,—নাম তার ল্যাডন। তা ছাড়া পরম সাবধানী অ্যাটলাস তাঁর উদ্যানের চারিধারে বিরাট প্রাচীর তুলেছেন। কোনো অপরিচিত লোক যেন উদ্যানে প্রবেশ না করে সেদিকে তাঁর কড়া নজর।

হারকিউলিসের প্রতি জুনোদেবীর ঘৃণার আগুনে ইন্ধন জোগানোর চমৎকার মতলব করলেন ইউরিস্থিউস। হারকিউলিসকে হুকুম দিলেন অ্যাটলাসের সুরক্ষিত উদ্যান থেকে জুনোর ঐ আপেল সংগ্রহ করে আনতে। দ্বিধা করল না দাসানুদাস।

মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে হারকিউলিস আবার চলেছেন সায়াহ্ন সূর্যের অভিমুখে। অ্যাটলাসের উদ্যান কোথায় তিনি জানেন না। এইটুকু মাত্র জানেন যে তাঁকে চলতে হবে পশ্চিমের পানে।

ইটালি দেশে পেঁৗছে পো নদীর তীরে তিনি বিশ্রাম করলেন। এই নদীর মোহানায় প্রাচীন নদীদেবতা নিরিউসের বাস। বৃদ্ধ নিরিউস ভূয়োদর্শী,—ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তিনি, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁর নখদর্পণে। তাঁর পঞ্চাশটি কন্যা। জলকন্যা তারা, সমুদ্রসৈকতে পিতার আশে-পাশে তারা থাকে।

পথসন্ধানহারা পরিশ্রান্ত হারকিউলিসকে দেবী মিনার্ভা উপদেশ দিলেন,—নিরিউসের প্রসাদ তোমাকে পেতে হবে, তাঁর সন্ধান কর। তিনি নানা মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেন। এইভাবে তিনি তোমাকে এড়াতে চাইবেন। কিন্তু তুমি তাঁকে ছেড়ো না।

হারকিউলিস উঠে দাঁড়ালেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি নিরিউসের সাক্ষাৎ পেলেন। সমুদ্রতীরে তিনি ঘুমিয়ে আছেন, দেহের উপরিভাগটা তীরে, নিম্নাঙ্গ জলের মধ্যে। জলজ লতা জড়িয়ে আছে তাঁর দেহে, শুভ্র কেশে শৈবালদাম। ঘুমন্ত পিতৃদেবকে ঘিরে রয়েছে নিরিউসের পঞ্চাশ জলকন্যা।

হারকিউলিসের পদশব্দ শুনে চকিত হয়ে উঠল জলকন্যার দল। কেউ লুকোলো বালিপাথরের আড়ালে, কেউ ঝাঁপ দিল সাগরজলে। তাদের চীৎকারে নিরিউসের ঘুম ভাঙার আগেই হারকিউলিস ছুটে গিয়ে দুহাতে তাঁকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলেন। নিরিউস বুঝলেন যে শক্ত হাতের বন্ধনে তিনি বাঁধা পড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ তরল জলধারা হয়ে গেল। কিন্তু হারকিউলিসের বাহুবন্ধন থেকে সেই তরলতাও মুক্তি পেলো না। পরমুহূর্তে হারকিউলিসের মনে হোলো,—শীতল জল নয়, জ্বলন্ত একটি স্তম্ভকে

তিনি যেন দুহাতে জড়িয়ে আছেন। উত্তাপে বাহুদ্বয় ঝলসে গেল তাঁর, তবু শিথিল হোলো না হাত। সেই অগ্ন্যুত্তাপের মধ্য দিয়ে হারকিউলিস তাঁর আঙুলে বৃদ্ধ নিরিউসের দেহকে অনুভব করতে লাগলেন। মুহূর্তমধ্যে কোথায় গেল সেই জ্বলন্ত অগ্নিস্তম্ভ,—হারকিউলিস দেখলেন, বিরাট এক সিংহ ছটফট করছে তাঁর বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে, গর্জন করছে করাল মুখব্যাদান করে।

এইভাবে নানা রূপ পরিগ্রহ করে নিরিউস হারকিউলিসকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হারকিউলিস কিছুতেই ছাড়লেন না সমুদ্রদেবতাকে। বৃদ্ধ সমুদ্রদেব শেষ পর্যন্ত আপন দেহে রূপান্তরিত হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন,—ছাড়ো ছাড়ো বাবা, হার মানছি তোমার কাছে! কিন্তু তুমি তো যে-সে নও হে! কী অভিপ্রায় তোমার?

বৃদ্ধ নিরিউসের মাথায় শুভ্র জটাভার। চোখে তাঁর এতোক্ষণে স্নেহমধুর দৃষ্টি।

হারকিউলিস আত্মপরিচয় দিলেন,—নিবেদন করলেন তাঁর মনস্কামনা।

নিরিউস হারকিউলিসকে অ্যাটলাসের স্বর্ণ-আপেলের উদ্যানের পথ বলে দিলেন। আরো উপদেশ দিলেন,—তিনি নিজে যেন আপেল না পাড়তে চেষ্টা করেন, কোন রকমে অ্যাটলাসকে দিয়েই যেন কটা ফল পাড়িয়ে নেন।

.

অ্যাটলাসের উদ্যান থেকে হারকিউলিস কী করে সোনার আপেল সংগ্রহ করলেন সে এক মজার কাহিনী। অ্যাটলাসের চোখের সামনে মেডুসার ছিন্ন মুণ্ড ধরে পার্সিউস তাঁকে পাথর করে দিয়েছিলেন,—কিন্তু এ কাহিনী অনুসারে অ্যাটলাস

তখন জীবিত। অহর্নিশি অন্তরীক্ষকে কাঁধের উপর ধরে আছেন, এক মুহূর্তের ছুটি নেই,—শ্রান্ত ক্লান্ত তাঁর অবস্থা।

নিরিউসের উপদেশ মতো হারকিউলিস অ্যাটলাসের কাছে সোনার আপেল চাইলেন। বললেন,—বাগান আপনার, আপেল দেবার অধিকারও আপনার। নিজে আপনি আমাকে কয়েকটি আপেল পেড়ে দিন। আমি গ্রীসে আমার প্রভু ইউরিস্থিউসের কাছে নিয়ে যাব।

অ্যাটলাস বললেন,—তা তুমি বহু দূর থেকে এত কষ্ট করে এসেছ, তোমার অনুরোধ রাখতে আপত্তি নেই। তবে কিনা, আমার কাঁধের এই ভারটি যে কিছুটা সময় তোমাকে কাঁধে নিতে হবে! নইলে আমি বাগানে গিয়ে আপেল পাড়ব কী করে?

হারকিউলিস বললেন,—বেশ তো! চাপিয়ে দিন আপনার বোঝা আমার কাঁধে।

অ্যাটলাস বললেন,—আমার মেয়েরা কিছুই বলবে না, কিন্তু ভয় আমার জুনোর পাহারাদার ঐ ল্যাডন ড্রাগনটাকে। ওটাকে ঠেকানো যায় কী করে বলো তো? ওটার ব্যবস্থা কিছু করতে পারো তুমি?

নিশ্চয় পারি।

উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করলেন হারকিউলিস। তাঁকে দেখেই হুহুঙ্কারে তেড়ে এল ল্যাডন। হারকিউলিস অব্যর্থ শরসন্ধানে তাকে বধ করলেন।

অ্যাটলাস তারিফ করলেন হারকিউলিসের বীরত্বের। বললেন—ব্যস, আর চিন্তা নেই। এইবার আমার বোঝাটা দু-মিনিটের জন্যে কাঁধে নাও, আমি এক্ষুনি গোটাকতক আপেল পেড়ে আনছি।

হারকিউলিস কাঁধ পাতলেন। হারকিউলিসের মনের কথা হোলো এই যে, অ্যাটলাস নিজেই যদি ফলগুলি সংগ্রহ করে দেন

তাহলে আপেল চুরির পাপ তাঁর নিজের উপর বর্তাবে না, জুনোর অভিশাপ নূতন করে বর্ষাবে না তাঁর মাথায়। আর অ্যাটলাসের মনের কথা হোলো,—তাঁর অনন্ত গুরুভার যদি হারকিউলিসের স্কন্ধে এক মুহূর্তের জন্যেও চাপাতে পারেন, সেই একটি মহার্ঘ মুহূর্তের বিশ্রাম পাবেন তিনি।

আপেলগুলি গাছ থেকে পেড়ে এনে অ্যাটলাস বললেন,—বাপু হে, তুমি তো অনেক ঘুরেছ,—এবার না-হয় কটা দিন স্থির হয়ে দাঁড়াও। আমি নিজে গিয়ে ইউরিস্থিউসকে আপেল কটা দিয়ে আসছি। যেতে আসতে আর ক-দিনই বা লাগবে! পৌঁছতে এক মাস, আর ফিরতে এক মাস। এই তুটি মাসের তো ওয়াস্তা—

হারকিউলিস বুঝলেন, কী রকম বোকা বনেছেন তিনি। অ্যাটলাস তাঁর কাঁধে সৃষ্টির বোঝা চাপিয়ে ছুটি নিয়ে সরে পড়তে চান। যতোদিন না ফিরবেন ততোদিন হারকিউলিসের মুক্তি নেই।

চট্ করে উপস্থিত বুদ্ধি খেলে গেল হারকিউলিসের মাথায়। বললেন,—বাঃ! এ আর এমন কথা কী? আপনি ঘুরে আসুন না! তু-মাস কেন, তিন মাসের আপনার ছুটি। আপনার তিন কন্যার আদর যত্নে এ তিন মাস বহাল তবিয়তে আমি কাটিয়ে দেব। তবে কিনা অভ্যাস তো নেই, কাঁধটায় বড়ো লাগছে। সৃষ্টির বোঝাটা এক মুহূর্ত আপনি ধরুন, আমি কাঁধের উপর একটা নরম কাপড় গুঁজে নিই।

আপেল কটি মাটিতে নামিয়ে রেখে যেই অ্যাটলাস আবার বোঝা কাঁধে নিয়েছেন, অমনি হারকিউলিস চতুর হাসি হেসে বললেন,—আচ্ছা প্রভু, নমস্কার!

যাবার সময় আপেল কটা কুড়িয়ে নিতে অবশ্য ভুললেন না হারকিউলিস।

স্বদেশে ফিরে হারকিউলিস সোনার আপেলগুলি ইউরিস্থিউসকে দিলেন, কিন্তু বৃন্তহীন আপেলগুলির স্বর্ণপ্রভা অল্প সময়ের মধ্যেই মলিন হয়ে গেল। মিনার্ভা দেবী ইউরিস্থিউসকে সাবধান করে বললেন,—দেবসম্রাজ্ঞীর আপেল ঘরে রাখা ঠিক নয়। আপেলগুলি নিয়ে তিনি বনদেবীদের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন।

পশ্চিম সীমান্তস্থিত অ্যাটলাসের রাজ্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে হারকিউলিস আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন,—বহু বীরত্ব-প্রকাশের সম্মান অর্জন করেছিলেন। লিবিয়ার রাজাকে চরম শাস্তিদান তাঁর এই পথের অন্যতম অভিজ্ঞতা।

লিবিয়ার রাজা অ্যান্টিউস ছিলেন নেপচুনের পুত্র। স্বয়ং মাতা ধরিত্রী তাঁর গর্ভধারিণী। অ্যান্টিউস মাতা ধরিত্রীর শেষ সন্তান ও বলিষ্ঠতম সন্তান। দৈত্যদের চেয়েও শক্তিশালী। তাঁর শক্তির কোনো ক্ষয় নেই, ধরিত্রীর স্পর্শে তাঁর পেশীতে পেশীতে মুহূর্তে মুহূর্তে নব বল সঞ্চারিত হয়। স্বয়ং দেবতারা তাঁকে ঘাঁটাতে ভয় পান। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ তাঁর প্রকৃতি। রাজ্যে কোনো বিদেশী শক্তিমান পুরুষ প্রবেশ করলে তাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে হত্যা করা তাঁর বিলাস।

এই মল্লযুদ্ধের আহ্বানে হারকিউলিসও অ্যান্টিউসের সম্মুখীন হলেন। সারা দেহে হারকিউলিস মালিস করে নিলেন তেল, আর অ্যান্টিউস মাখলেন মাটি। এই মাটিই তাঁর শক্তির সঞ্জীবনী।

প্রহরের পর প্রহর ধরে লড়াই চলল। মহাবীর হারকিউলিসের

সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারলেন না অ্যাণ্টিউস। বরং হারকিউলিস তাঁকে বারে বারে মাটিতে উল্টে ফেলে দিতে লাগলেন। কিন্তু অ্যাণ্টিউসকে হারানোও অসম্ভব। যতোবার মাটিতে পড়েন, ততোবার মাতা ধরিত্রীর আশীর্বাদে ফুলে ফুলে ওঠে তাঁর পেশী, নূতন শক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর অঙ্গ। এমনকি অ্যাণ্টিউস মাঝে মাঝে ইচ্ছা করেই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নেন,—আবার নববলিষ্ঠ নূতন উদ্যমে আক্রমণ করেন হারকিউলিসকে।

হারকিউলিস শেষ পর্যন্ত বুঝলেন, মাটিতে ফেলে অ্যাণ্টিউসকে পরাস্ত করা যাবে না। আশ্চর্য প্রতিদ্বন্দ্বী,—মাটি যার পরাজয় নয়, জয়েরই মূলধন! এমনকি যতোক্ষণ মাটির উপর দুই পা আছে ততক্ষণ অ্যাণ্টিউসের ক্লান্তি নেই।

অশ্রান্ত মল্লযুদ্ধ চলেছে। ওলটপালট খাচ্ছেন দুই বীর। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারছেন না। হারকিউলিসকে যখন অ্যাণ্টিউস চেপে ধরছেন, তখন তাঁকে প্রাণপণ চেষ্টায় ছাড়িয়ে নিতে হচ্ছে নিজেকে। অ্যাণ্টিউসকে যখন হারকিউলিস মাটিতে পেড়ে ফেলছেন, তখন অ্যাণ্টিউসের ক্ষমতা বাড়ছে, অবলীলাক্রমে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন তিনি।

হঠাৎ এক বিচিত্র কৌশলের সুযোগ নিয়ে হারকিউলিস দু-হাতে অ্যাণ্টিউসকে মাথার উপর তুলে ধরলেন। তারপর আর-এক কৌশলে অ্যাণ্টিউসের দুই কাঁধ চেপে ধরে গদার মতো বনবন করে ঘোরাতে লাগলেন তাঁর দেহ। গলায় চাপ পড়ছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে অ্যাণ্টিউসের। ঘুর্নির প্রবল পাকে ঝিম-ঝিম করছে মস্তিষ্ক, দেহের সব রক্ত উঠে আসছে মাথার মধ্যে। মাটির স্পর্শ নেই, নেই নূতন শক্তির জোয়ার। কিছুক্ষণ এমনি যাওয়ার পর হঠাৎ এক মুহূর্তে ঘুর্নি থামালেন হারকিউলিস, আর অ্যাণ্টিউসকে নিজের কাঁধের উপর নিয়ে দু-হাতের প্রচণ্ড চাপে দু-টুকরো করে ফেললেন

তাঁর শিরদাঁড়া। যখন বুঝলেন নিঃশেষ হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণবায়ু, তখন নিষ্প্রাণ দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। মাতা ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাস আকাশকে ছেয়ে দিল কালো মেঘে, মাতা ধরিত্রীর সন্তান-শোকের ক্রন্দন শ্রাবণ-সিঞ্চন করল লিবিয়া মরুভূমির বুকে।

আট

উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী, শিখরের পর শিখর পূর্ব থেকে পশ্চিম জুড়ে। মাঝে কঠিন বন্ধুর গিরিবর্ত্ম। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝখানে সুদীর্ঘ প্রাচীর এই পর্বতমালা। নাম ককেশাস।

দিনের পর দিন যায়, আবর্তিত হয় বৎসরের পর বৎসর। এখানে বসন্ত-প্রভাত আসে না মলয়হিল্লোলে নবপুষ্পসুরভির অর্ঘ্য নিয়ে, আসে না মেঘকজ্জল মেদুর প্রাবৃট্ সন্ধ্যা। আসে না হরিৎ-হিরণ শস্যশ্যামল শরৎ, নামে না ধূসর কোমল হেমন্তছায়া। দুটি মাত্র ঋতু। গ্রীষ্ম,—যখন পাথরের বুক নীরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রচণ্ড দাবদাহে, আর শীত,—যখন সেই পাথর পরে শ্বেত তুষারের মৃত্যুমুকুট। জীবন এখান থেকে মুখ ফিরিয়েছে,—নেই শষ্প, নেই কোনো প্রাণী।

অ্যাটলাসের রাজ্য থেকে ফিরবার পথে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে হারকিউলিস এসেছেন এই ককেশাস শিলা-রাজ্যে। পশ্চিম থেকে পূর্বসীমান্তে, সমুদ্র থেকে পর্বতে,—নিত্য-উদ্বেলিত নিত্য-জাগ্রত সমুদ্রতরঙ্গ থেকে নিত্যস্থির চিরঘুমন্ত পাষাণ-তরঙ্গ-বেলায়। একলা পথিক হারকিউলিস, চলেছেন এক শীর্ণ গিরিবর্ত্ম ধরে, যে পথে মানুষ কখনো পথিক হয়নি। নিঃসঙ্গ বীর চলেছেন নীরস পাষাণের বুকে পা ফেলে ফেলে কোন্ বিচিত্র অভিজ্ঞতার অভিসারে।

তখন পূর্বগগনের স্বর্ণসিংহদ্বারের অর্গলে সবেমাত্র উষাদেবীর

চম্পক-অঙ্গুলিস্পর্শ লেগেছে। অন্ধকার নিম্নভূমি, সুষুপ্ত ধরাতল। হারকিউলিসের চকিত দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল। সামনেই এক বিরাট গিরিশৃঙ্গ। সেই শৃঙ্গের উপরে উপবিষ্ট এক বিরাট পুরুষ। উষার রক্তিম আলো লেগেছে তাঁর শ্বেত কেশদামে,—অন্ধকার তখন জড়িয়ে আছে তাঁর বলিরেখাকীর্ণ মুখমণ্ডলে। অন্ধকারে তাঁর বিরাট দেহ আচ্ছন্ন।

কয়েক পা এগিয়ে গেলেন হারকিউলিস। নিশ্চল মূর্তিটি স্পষ্ট হোলো দৃষ্টিতে। শৃঙ্গসদৃশ ললাট, কবাটতুল্য বক্ষ, শালপ্রাংশু বাহু। শৃঙ্খলিত হস্তপদ, আয়ত নেত্র নিমীলিত।

পায়ে পায়ে কাছে গেলেন হারকিউলিস। দাঁড়ালেন এই শৃঙ্খলিত মহাপুরুষের সামনে। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,—প্রমিথিউস ?

উন্মীলিত হোলো চক্ষু। সৃষ্টির সমস্ত বেদনা আর সমস্ত সংযম যেন সংহত হয়ে রয়েছে সেই দৃষ্টিতে।

হ্যাঁ, আমি প্রমিথিউস। তুমি কে ?

আমি হারকিউলিস।

মানবের আদিম স্রষ্টা আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব দাঁড়ালেন মুখোমুখি।

এখানে কেমন করে এলে ? কেন এলে ?

এসেছি আপনারই সন্ধানে।

জুপিটারের পুত্র তুমি না ? চলে যাও!

সমুদ্র পার হয়েছি, পার হয়েছি পর্বত মরু। চলে যাব বলে আমি আসিনি প্রমিথিউস! আরো একটি ভুল বলেছেন আপনি। জুপিটারের পুত্র, এই আমার পরিচয় নয়। আমার পরিচয়—আমি মানুষ। মানুষের যিনি স্রষ্টা, মানুষের যিনি আদিম বন্ধু, অনন্ত বন্দীত্ব থেকে তাঁকে মুক্ত করতে আমি এসেছি।

রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে প্রমিথিউসের শৃঙ্খলিত বক্ষ ফুলে উঠল।

মানুষ তুমি! বটে? কিন্তু জুপিটারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে, এতো সাহস কি মানুষের হয়েছে?

হ্যাঁ প্রভু, প্রকৃত ন্যায়-অন্যায়বোধ মানুষেরই অধিকারে। সেই অধিকারে মানুষের মনুষ্যত্ব দেবত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে,—সেই শক্তিতে মানুষ দেবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় না।

সূর্য উঠল। হঠাৎ রাঙা আকাশ কালো করে চক্রবাল থেকে উড়ে এল বিরাট শকুন। এই শকুন প্রমিথিউসের ভাগ্যে জুপিটারের প্রতিদিনের অভিশাপ। এই শকুন প্রতিদিন প্রভাতে এসে বন্দী প্রমিথিউসের যকৃৎ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

হারকিউলিস প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। বীভৎস মুখ ব্যাদান করে শকুনটা নেমে আসছিল। ধনুতে তীর যোজনা করে অব্যর্থ লক্ষ্যে হারকিউলিস বিদীর্ণ করলেন শকুনের বক্ষ। তীরের ফলায় হাইড্রার বিষ। আর্ত চীৎকার করতে করতে পাথরের উপর লুটিয়ে পড়ে শকুনটা মরে গেল। তার শেষ আর্তনাদ অলিম্পাসে জুপিটারের কানে গিয়ে পৌঁছলো।

হারকিউলিস প্রমিথিউসের অঙ্গের শিকলগুলি বারেক পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন,—আর কয়েক মুহূর্ত ধৈর্য ধরুন পিতঃ। এই শিকল আমি গদাঘাতে চূর্ণ করব।

কী সর্বনাশ! দেবরাজের শাসনকে উড়িয়ে দিতে চায় মানুষ হারকিউলিস! এই শৃঙ্খল দেবরাজের নির্দেশে ভালকান বানিয়েছেন তাঁর স্বর্গীয় কর্মশালায়,—এই অটুট শৃঙ্খলে দেবরাজ নিজে বেঁধেছেন প্রমিথিউসকে, সেই শৃঙ্খলকে খান্ খান্ করতে উদ্যত মানুষ হারকিউলিস! তাহলে হারকিউলিসই কি জুপিটারের সেই পুত্র, যে

পিতার চেয়ে শক্তিশালী হবে, জয় করবে পিতার কর্তৃত্ব, জয় করবে অলিম্পাসের সিংহাসন?

শৃঙ্খলের উপর হারকিউলিস তাঁর গদার প্রথম আঘাত হানলেন। সেই আঘাতে কম্পিত হোলো ককেশাস পর্বতশৃঙ্গ, সেই কম্পনে প্রতিকম্পিত হোলো দেবরাজ্য অলিম্পাস। জুপিটার স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন ককেশাসে। সঙ্গে দেবদূত মার্কারি।

মার্কারি হাঁকলেন,—তোমার মুষল সংবরণ করো হারকিউলিস! তোমার সম্মুখে উপস্থিত দেবরাজ জুপিটার।

হাত থেকে সমস্ত অস্ত্র ফেলে দিলেন হারকিউলিস, নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন জনককে।

জুপিটারের প্রিয়তম পার্থিব পুত্র হারকিউলিস। মানবনন্দিনীর গর্ভে তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তান।

জুপিটার বললেন,—তোমার শৌর্যে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি পুত্র। কী বর তুমি চাও?

অবিচলিত কণ্ঠে হারকিউলিস উত্তর দিলেন,—প্রমিথিউসের মুক্তি।

তা হয় না বৎস! প্রমিথিউসের শাস্তির অবসান নেই।

কিন্তু এ শাস্তি অন্যায়, নির্ভীক হারকিউলিস উত্তর দিলেন,—প্রমিথিউসের এই শাস্তি কেন? কী অন্যায় তিনি করেছেন? সভ্যতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মানুষকে তিনি দিয়েছেন,—এই তাঁর অপরাধ? অপরাধ নয়। এই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সৃষ্টির সুন্দরতম বিকাশ মানব-সভ্যতা। মানুষ যদি সভ্য না হত তাহলে দেবতার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করত কে? সুন্দর দেবমূর্তি গড়ে দেবতার উপাসনা করত কে? দেবত্বকে মর্তের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করত কে?

মুহূর্তের স্তব্ধতা ভেঙে জুপিটার বললেন,—প্রমিথিউসের আসল অপরাধের কথা তুমি জানো না বৎস। প্রমিথিউস এক গোপন

রহস্যের অধিকারী, সে রহস্যের উদ্ঘাটনের উপর আমার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে।

এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলেন প্রমিথিউস। নীরবে তাকিয়ে ছিলেন জুপিটারের মুখের দিকে। এই জুপিটার,—যার তিনি বন্ধু, যার তিনি সখা। যার হয়ে তিনি একদা মরণ-পণ করে যুদ্ধ করেছিলেন সগোত্র টাইটানদের বিরুদ্ধে। অলিম্পাসের সিংহাসনে যার নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা তাঁরই জন্যে সম্ভব হয়েছিল। আর বিনিময়ে যে তাঁকে নৃশংসতম অত্যাচারে অনন্তকাল দগ্ধ করে চলেছে।

এতক্ষণে মুখর হোলো প্রমিথিউসের জলদ-গম্ভীর কণ্ঠ,—কিন্তু সে রহস্য তুমি তো আমার কাছে জানতে চাওনি?

জানতে চাইনি? অবাক বিস্ময়ে শুধোলেন দেবরাজ।

না, জানতে চাওনি, প্রমিথিউস বললেন,—জিজ্ঞাসা করোনি, অনুরোধ করোনি বন্ধুভাবে। মার্কারিকে পাঠিয়ে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করে নিতে চেয়েছিলে। প্রমিথিউস ভয় পায় না। অত্যাচার করে আমার মুখ খুলতে চেয়েছিলে,—সে অত্যাচারে প্রমিথিউস আত্মসমর্পণ করে না। অতীত বিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়ে তোমাকে রক্ষা করেছি, আর তোমার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা জেনে তোমাকে সাবধান আমি করতাম না? নিশ্চয়ই করতাম। কিন্তু তুমি তা চাওনি। তুমি আমাকে ভাঙতে চেয়েছিলে। প্রমিথিউস ভাঙে না।

জুপিটার একবার তীব্র দৃষ্টিতে হারকিউলিসের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আপন হাতে প্রমিথিউসের শৃঙ্খল খুলে দিলেন। প্রমিথিউসের দু-হাত ধরে বললেন,—আমাকে ক্ষমা করো বন্ধু। অপরাধ তোমার নয়, আমার। বাঁচাও আমাকে। উদ্ঘাটন করো ঐ সাঙ্ঘাতিক রহস্য। কে সে, দেবী না মানবী, বলো তার নাম,—যার গর্ভে আমার যদি পুত্র জন্মায়, সেই পুত্র আমাকে

সংহার করে আমার সিংহাসন অধিকার করবে ?

প্রসন্ন ক্ষমাসুন্দর হাসি হাসলেন প্রমিথিউস। মুক্ত তিনি, ক্ষোভমুক্ত তাঁর মন অত্যাচারীর অনুতাপে। হারকিউলিসের মাথায় দক্ষিণ হস্ত রেখে তাঁকে প্রাণভরা আশীর্বাদ করলেন প্রমিথিউস। তারপর জুপিটারকে বললেন,—ভয় নেই তোমার। সেই নারী আল্কমিনা নয়, সেই পুত্র এখনো জন্মগ্রহণ করেনি। এখনো তোমার সাবধান হবার সময় আছে।

মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জুপিটারও। তারপর ব্যগ্র কণ্ঠে আবার শুধোলেন,—আমি অনুরোধ করছি বন্ধু, বলো কে সে? তাকে আমি স্পর্শও করব না। কোনো দেবতা তাকে স্পর্শ করবে না। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তার বিবাহ দেব।

তার নাম থেটিস। বীরমাতা হবে সে। কিন্তু সেই বীরপুত্র যদি তোমার সন্তান হয়, সংহার করবে তোমাকেই।

থেটিস!

সমুদ্রের দেবী থেটিস। নিরিউসের কন্যাগণ তাঁর সহচরী। সমুদ্র-রাজ নেপচুন তাঁর প্রণয়প্রার্থী। জুপিটারও তাঁর জন্যে পাগল। প্রমিথিউসের ভবিষ্যৎবাণীতে সাবধান হলেন জুপিটার, সাবধান করলেন নেপচুনকে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন দুজনেই,—থেটিসকে তাঁরা কখনো স্পর্শ করবেন না।

হারকিউলিসকে আবার শুধোলেন জুপিটার,—পুত্র, তুমি কী বর চাও?

হারকিউলিস বললেন,—পিতা, মহাপণ্ডিত অশ্বমানব কাইরনকে আপনি অমরত্বের বর দিয়েছেন। কাইরন আমার গুরু। কিন্তু হাইড্রার বিষ-মাখানো আমারই শরাঘাতে তিনি অনির্বাণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছেন। অহর্নিশি মৃত্যু-কামনা করলেও আপনার বরে মৃত্যু তাঁর নেই। আমি কোনো বর চাইনে। আমার গুরু কাইরনকে

যে বর আপনি দিয়েছেন তা শুধু ফিরিয়ে নিন।

জুপিটার বললেন,—তথাস্তু।

কাইরনের চেষ্টায় মর্তমানব পিলিউসের সঙ্গে সমুদ্রদেবী থেটিসের বিবাহ হোলো। এই আশ্চর্য মিলনে অলিম্পাসের সব দেবদেবীরা আমন্ত্রিত হলেন। এই মিলনের ফলে ভূমিষ্ঠ হলেন মহাবীর অ্যাকিলিস্।

থেটিসের বিবাহের পর কাইরনের অমরত্ব হরণ করলেন জুপিটার।

অমর টাইটান প্রমিথিউসকে বন্দীত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিলেন হারকিউলিস। আবার অমর কাইরনকেও মুক্তি দিলেন হারকিউলিস,—অমরত্বের বন্দীশালা থেকে মৃত্যুর নীলাম্বরে। কাইরনের মুক্ত আত্মা আকাশের একটি উজ্জ্বল তারা হয়ে ফুটে রইল জুপিটারের আশীর্বাদে।

নয়

পাতালপুরী টার্টারাস প্লুটোর রাজ্য। এইখানে প্রেতগণের বাস। মৃত্যুবৈতরণী স্টিক্স নদী অতিক্রম করে পৌঁছতে হয় এই রাজ্যের সীমানায়। প্লুটোর রাজপুরীর সিংহদ্বারে দিবারাত্রি পাহারা দেয় তিনমুখওয়ালা বিরাট কুকুর,—সার্বেরাস। এই ভয়ঙ্কর প্রাণী দৈত্য টাইফনের অন্যতম সন্তান।

হারকিউলিসের আর একটিমাত্র কর্তব্য বাকি। দ্বাদশ কর্তব্য সম্পাদন করবার পর তাঁর দাসত্বের অবসান হবে। ইউরিস্থিউস তাঁকে দিলেন দুরূহতম কাজ। মর্তভূমি পরিত্যাগ করে তাঁকে যেতে হবে প্রেতভূমিতে, সেখান থেকে জীবন্ত ধরে আনতে হবে ঐ তিনমুখ-ওয়ালা হিংস্র শ্বাপদ সার্বেরাসকে।

জীবন্ত অবস্থায় প্লুটোর প্রেতরাজ্যে আর তিনটি মাত্র মানুষ ইতিপূর্বে গিয়েছিল। অর্ফিউস গিয়েছিলেন তাঁর মৃতা পত্নী ইউরিডাইসের প্রেমে পাগল হয়ে। স্ত্রীকে তিনি উদ্ধার করে আনতে পারেন নি, তবে নিজে ফিরে আসতে পেরেছিলেন শ্যামলা ধরিত্রীর ক্রোড়ে। আর গিয়েছিলেন থেসিউস ও তাঁর বন্ধু পিরিথৌস। উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল মন্দ,—তাঁরা দুজনেই বন্দী হয়ে আছেন টার্টারাসে। এবার চললেন হারকিউলিস।

পথে কতো বাধা যে এল তার শেষ নেই। সব বাধা তিনি জয় করলেন। ভয় দেখাতে এল সর্পকেশী ক্রোধকন্যার দল, সে-ভয় তাঁর কাছে হার মানল। তাঁর ভয়ঙ্কর চেহারা আর ভীম ভ্রূকুটি দেখে স্টিক্স নদীর কাণ্ডারী চারন ভয়ে-ভয়ে তাঁকে ওপারে নিয়ে গেল।

প্রেতরাজ্যের তীরভূমিতে পৌঁছবামাত্র তাঁর বীরমূর্তি দেখে শীর্ণ ধূসর প্রেতের দল ছুটে পালাতে লাগল। শুধু তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল গর্গনভগ্নী মেডুসার কবন্ধ প্রেতমূর্তি। এই মেডুসাকে হত্যা করেছিলেন পার্সিউস, তার মাথাটা বসিয়ে দিয়েছিলেন দেবী মিনার্ভার অক্ষয় ঢালের মাঝখানে। মেডুসার মস্তকহীন বিকট মূর্তি দেখে হারকিউলিস তরবারি হাতে তার দিকে তেড়ে গেলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়ল,—এ তো সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী নয়, তার প্রাণহীনা শক্তিহীনা ছায়ামূর্তি মাত্র। মেডুসার বাক্যহীন প্রেত-ছায়া ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে গেল তাঁর সম্মুখ থেকে।

প্রেতরাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে হারকিউলিস সেই দুই কুখ্যাত পাপীর প্রেতমূর্তির সাক্ষাৎ পেলেন যারা মৃত্যুর পর এখানে এসে চিরন্তন

শাস্তি ভোগ করছে। এই দুই মহাপাপীর নাম ট্যাণ্টালাস ও সিসিফাস।

অতি প্রাচীন কালের কথা। ট্যাণ্টালাস ছিল লিডিয়ার রাজা। জুপিটারের অতি প্রিয় বয়স্য ছিল সে,—দেবরাজের আমন্ত্রণে অলিম্পাসের স্বর্গসভায় আনন্দভোজে আমন্ত্রিত হত মর্তবাসী ট্যাণ্টালাস। রাজা ট্যাণ্টালাস একদিন দেবগণকে তার রাজপুরীতে নিমন্ত্রণ করল। দেবগণও সেই নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। কোন্ দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে ট্যাণ্টালাস তার নিজ পুত্রকে কেটে আপন সন্তানের মাংস রান্না করে দেবতাদের পরিবেশন করল।

দেবতারা বুঝতে পারলেন কিসের মাংস ট্যাণ্টালাস তাঁদের খেতে দিয়েছে। তাঁরা ট্যাণ্টালাসকে এমন শাস্তি দিলেন, যে শাস্তির কথা মর্তবাসী কখনো ভুলবে না,—সেই শাস্তির কথা স্মরণ করে এমন জঘন্য পাপকার্য কোনো মানুষ দ্বিতীয়বার করতে সাহস করবে না।

মৃত্যুপুরীর একটি স্বচ্ছ দীর্ঘিকার মধ্যে বন্দী হয়ে রইল ট্যাণ্টালাসের প্রেতাত্মা অচরিতার্থ অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে। মাথার উপর ঠিক নাকের সামনে ঝুলছে সুপক্ক রসপূর্ণ আঙুর জলপাই প্রভৃতি ফল। ট্যাণ্টালাস যখনই হাত বাড়িয়ে সেই ফল নিতে যায়, অমনি কোথা থেকে এক দমকা হাওয়া এসে ফলের গুচ্ছকে নিয়ে যায় নাগালের বাইরে। বুকের কাছে টলটল করছে দীর্ঘিকার স্ফটিকস্বচ্ছ জল। যখনই ট্যাণ্টালাস মুখ নিচু করে সেই জল পান করতে যায়, অমনি সেই জল পায়ের নিচে দিয়ে অদৃশ্য হয় মাটির অভ্যন্তরে। অনন্তকাল অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহাপাপী ট্যাণ্টালাস।

সিসিফাস ছিল আর এক প্রাচীন রাজা। করিন্থ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা বলে সিসিফাসের নাম। সিসিফাস ছিল যেমন ধূর্ত তেমনি নিষ্ঠুর। তার অত্যাচারে দেশবাসী উন্মাদ, বিদেশী পথিকের

ধনপ্রাণ বিপন্ন। দেবতাদের সে গ্রাহ্য করে না, বরং নানা চাতুরী করে সে তাঁদের বিপদে ফেলবার সুযোগ খোঁজে। শেষ পর্যন্ত দেবরাজ জুপিটারের রোষবহ্নিতে সে পুড়ে মরল। সমুদ্রদেব আসোপাসের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম ঈজিনা। জুপিটার এই কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং এক বিশালকায় বাজপাখির ছদ্মবেশে তাকে হরণ করলেন। এই হরণের দৃশ্য সিসিফাসের চোখে পড়ে। আসোপাস তখন তাঁর কন্যার সন্ধানে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সিসিফাস এই কন্যার সন্ধান আসোপাসকে দেয়, ফলে আসোপাসের হাতে লাঞ্ছিত হন জুপিটার।

দেবকন্যার প্রতি দেবরাজের আকর্ষণের মধ্যে মর্তমানবের নাক গলানো কিছুতে সহ্য করা যায় না। বিশেষত সেই মানব যদি হয় সিসিফাসের মতো হীনচরিত্র লোক। দেবরাজের গোপন লীলাকে সে নিছক স্বার্থসিদ্ধির বিনিময়ে প্রকাশ করেছে। দেবরাজের আদেশে প্লুটো সিসিফাসকে হত্যা করে তার প্রেতাত্মাকে প্রেতপুরীর এক পাহাড়ের নিচে নিয়ে গেলেন। তার সামনে রাখলেন একটি বিরাট পাথরের গোলক। শাস্তি হোলো অসাধারণ। সিসিফাস পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে বুকে হেঁটে ভারী গোলকটি পাহাড়ের মাথায় তোলার চেষ্টা করে। ঠিক শিখরের কাছে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে গোলকটি গড়িয়ে পাহাড়ের নিচে পড়ে যায়। আবার সিসিফাস গোলকটিকে তুলতে চেষ্টা করে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঠেলে ঠেলে। তার এই চেষ্টার শেষ নেই, নিবৃত্তি নেই তার পরিশ্রমের। অবসান নেই তার শাস্তির।

প্রেতরাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে হারকিউলিসের দেখা প্রিয় বন্ধু থেসিউসের সঙ্গে। থেসিউস আর তাঁর বন্ধু পিরিথৌস পাশাপাশি

বসে আছেন দুই পাথরের উপর, বসে আছেন বছরের পর বছর। তাঁরা দুজনে এসেছিলেন রানী প্রসের্পিনকে হরণ করবার দুরভিসন্ধি নিয়ে। প্লুটো তাঁদের দিয়েছেন আশ্চর্য শাস্তি। দুই পাথরের ঢিপির উপর বসিয়ে দিয়েছেন তাঁদের, আর তাঁদের উঠবার শক্তি নেই। ঐ আশ্চর্য পাথর তাঁদের পাপের ভারকে এমনি চুম্বক-আকর্ষণে টেনে রেখেছে যে তাঁরা উত্থানশক্তিরহিত।

প্রেতরাজ প্লুটো ও রানী প্রসের্পিন হারকিউলিসকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

প্লুটো শুধোলেন,—কী উদ্দেশ্যে তোমার আগমন?

হারকিউলিস মনস্কামনা নিবেদন করলেন।

প্লুটো একবার মৃদু হাস্য করলেন প্রসের্পিনের মুখের দিকে চেয়ে। তারপর বললেন,—সার্বেরাসকে মর্তে নিয়ে যেতে চাও? বেশ, আমার আপত্তি নেই। তবে ওর গায়ে কোনো অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে না। শুধু হাতে যদি ওকে বন্দী করে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে আমি বাধা দেব না।

হারকিউলিস আর একটি অনুরোধ করলেন,—থেসিউস আর পিরিথৌস আমার দুই বন্ধু,—এদের আপনি মুক্তি দিন।

প্লুটো প্রসের্পিনকে শুধোলেন,—ওদের শাস্তি যথেষ্টই হয়েছে,—না?

প্রসের্পিন মৃদু হেসে বললেন,—মন্দ হয়নি।

হারকিউলিসকে প্লুটো বললেন,—বেশ, যদি ওদের টেনে তুলতে পারো, তুলে নিয়ে যাও।

হারকিউলিস এক প্রচণ্ড টান মারলেন থেসিউসের দু-হাত ধরে। থেসিউস উঠে দাঁড়ালেন। পাথরের আসনের মরণ-কামড় থেকে মুক্তি পেলেন তিনি। কিন্তু পিরিথৌসের পাপ অধিকতর। হারকিউলিস অনেক চেষ্টা করেও পিরিথৌসকে মুক্ত করতে পারলেন না।

এবার হারকিউলিস গেলেন সার্বেরাসকে ধরতে। তাঁকে দেখেই ভীষণ শিকারী-শ্বাপদ তার রক্তাক্ত ত্রিমুখের লোল জিহ্বা বিস্তার করে ভীমবেগে আক্রমণ করল। এমনি আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন হারকিউলিস। প্রস্তুত ছিলেন বিনা অস্ত্রাঘাতে তাকে পরাস্ত করবার জন্যে। বিদ্যুতের মতো হারকিউলিস ঝাঁপিয়ে পড়লেন সার্বেরাসের উপর। দু-হাতে তার তিনটি গলা একসঙ্গে টিপে ধরলেন। নেতিয়ে পড়ল টাইফন-তনয়ের তিনটি জিভ, ঠিকরে বার হয়ে আসতে লাগল তার তিনজোড়া রক্তচোখ। অর্ধমূর্ছিত সার্বেরাসকে কাঁধে ফেলে হারকিউলিস যাত্রা করলেন মর্তলোকের উদ্দেশ্যে।

দশ

দ্বাদশ বর্ষের দাসত্বের হোলো অবসান, প্রায়শ্চিত্ত হোলো সম্পূর্ণ। মুক্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন হারকিউলিস। মহা পাপ করেছিলেন স্ত্রীপুত্রহন্তারক হারকিউলিস। সে পাপ অনিচ্ছাকৃত, সে পাপ জুনোর অভিশাপ। সেই পাপের দুরূহ প্রায়শ্চিত্ত তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। দ্বাদশ বছরের দাসত্বকালে তিনি নিজেকে প্রমাণিত করেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর বলে। তাঁর নাম ঘোষিত হয়েছে দিক্-দিগন্তরে। জুনোর ঈর্ষাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেছে,—প্রকাশ করেছে হেরাক্লেস নামের নূতন অর্থ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন হারকিউলিস। ভাবলেন এবার তিনি শান্তি পাবেন, সহজ জীবনের অধিকারী হবেন। কিন্তু তা হোলো না। যার ললাটে দেবসম্রাজ্ঞীর ক্রূর ঈর্ষাস্পর্শ, সে পুরুষোত্তম হলেও অকল্পনীয় যশের অধিকারী হলেও তার ভাগ্যে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই।

ইকালিয়া রাজ্যের রাজা ইউরিটাস ছিলেন বিখ্যাত তীরন্দাজ। তিনি ঘোষণা করেছিলেন,—লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় সে তাঁকে পরাজিত করতে পারবে তার সঙ্গে তিনি তাঁর কন্যা ইয়োলএর বিবাহ দেবেন। সংসারসুখতৃষার্ত হারকিউলিস ইয়োলের পাণি-প্রার্থী হলেন ও রাজা ইউরিটাসকে পরাস্ত করলেন ধনুর্বিদ্যার প্রতিযোগিতায়।

কিন্তু ইউরিটাস কথা রাখলেন না। হারকিউলিসের কাছে পরাজিত হয়ে ক্ষোভে তাঁর মুখ কালো। হারকিউলিসের পূর্বপত্নী মিগারার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে হাঁকিয়ে দিলেন তাঁকে, —খুনে পাগলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব আমার! চালাকি পেয়েছ?

হারকিউলিস ক্রোধে আগুন! বহু কষ্টে মুহূর্তের জন্যে সংবরণ করলেন নিজেকে। বলে এলেন—এই বিশ্বাস-ভঙ্গের শাস্তি তুমি একদিন পাবে।

শাস্তি তিনি শেষ পর্যন্ত দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই শাস্তিই তাঁর নিজের কাল হয়েছিল।

ইলিস রাজ্য আক্রমণ করলেন হারকিউলিস। রাজা অগিয়াসের গোশালা তিনি পরিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু অগিয়াস বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তোলা ছিল।

ইলিস রাজ্য জয় করার পর হারকিউলিস বিজয় অভিযানে বার হলেন। তার পূর্বে তিনি প্রবর্তন করলেন বিশ্ববিখ্যাত অলিম্পিক উৎসবের। এই উৎসবের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন তাঁর পিতা জুপিটারের সম্মানার্থে। কথিত আছে প্রথম উৎসবে গ্রীসের অগণিত বীরবৃন্দ শক্তিপরীক্ষার জন্য সমবেত হন। কিন্তু প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই

জয়লাভ করেন হারকিউলিস। শেষ পর্যন্ত মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় দেবরাজ জুপিটার নিজেই মানুষের ছদ্মবেশে অবতীর্ণ হন। পুত্রের সঙ্গে তিনি এঁটে উঠতে পারেন নি। হারকিউলিসের হাতে পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন তিনি যুদ্ধ থামিয়ে দেবদেহ পরিগ্রহ করেন ও বিশ্ববিজয়ী পুত্রকে আশীর্বাদ করেন।

বিভিন্ন রাজ্য হারকিউলিস জয় করলেন,—বহুতর অকুতোভয় শক্তির পরীক্ষায় জয়ী হলেন। দিকে দিকে বন্যজন্তু ও দস্যুর দল তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করল। নির্ভয় হোলো গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যের শান্তিপূর্ণ অধিবাসী।

এবার ক্যালিডন রাজকুমারী ডিয়ানিরার পাণিপ্রার্থী হলেন হারকিউলিস। ক্যালিডনরাজ ইনিউসের কনিষ্ঠা কন্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ডিয়ানিরা,—মহাবীর মিলিয়েগারের ভগ্নী। ডিয়ানিরার পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু হারকিউলিসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সকলেই বিরত হলেন। কেবল একজন ছাড়া,—নদীদেবতা আকেলাস। আকেলাস ত্রিমূর্তিধারী ছিলেন। কখনো কালসর্পের, কখনো যণ্ডের, কখনো বৃষমুখ মানুষের রূপ তিনি ধারণ করতে পারতেন। তাঁর বিশাল জটা আর দাড়ি থেকে সর্বদা জল ঝরে পড়ত,—বিরাট তাঁর বক্ষ জুড়ে ছিল কালো শ্যাওলার আবর্জনা।

রাজা ইনিউসের দরবারে উপস্থিত হলেন দুই পাণিপ্রার্থী। হারকিউলিসের বীরখ্যাতি ডিয়ানিরার অজানা ছিল না,—নরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিস তার মতো সামান্য কুমারীকে গ্রহণ করতে চান,—রোমাঞ্চিত তার অঙ্গ, দুরু-দুরু কম্পিত তার হৃদয়। এখন স্বচক্ষে সে দেখল হারকিউলিসের অপূর্ব বীরকান্তি। মুহূর্তে সে তার নীরব অন্তর-কামনা উৎসর্গ করল পুরুষোত্তমের চরণে।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী যে অমর দেবতা! ডিয়ানিরা মনে মনে বললে—

ঐ বীভৎস বৃদ্ধ মৃত্যুহীনের হাতে আত্মসমর্পণের চেয়ে মৃত্যু ভাল।

হারকিউলিস বললেন ইনিউসকে,—জুপিটার আমার পিতা। আমাকে যদি আপনার কন্যা সমর্পণ করেন তাহলে দেবরাজ-পুত্রকে জামাতারূপে লাভের গৌরব আপনি অর্জন করবেন। তা ছাড়া আমার বিশ্বখ্যাত দ্বাদশ শ্রমের গৌরবেরও অংশভাগী হবেন আপনি।

অট্টহাস্য করলেন নদীদেবতা আকেলাস। বললেন,—আমি দেবতা, সৃষ্টির আদিম জলধারার জনক। বিশ্বপূজিত আমি। আমি মরণশীল মানুষ নই, আমি দাস নই, আমি কুলটার সন্তান নই।

অপমানে কালো হয়ে উঠল হারকিউলিসের মুখ। এতো বড় অপমান তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেউ তাঁকে করতে সাহস করেনি। মুহূর্তপরে সে মুখ আকাশ-সবিতার মতো রক্তবর্ণ ধারণ করল। সমুদ্র-তরঙ্গের মতো ফুলে ফুলে উঠল তাঁর দেহের প্রতিটি মাংসপেশী। ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি আকেলাসের উপর।

আকেলাসও অপ্রস্তুত ছিলেন না। তুমুল লড়াই শুরু হোলো মানব ও দেবতার মধ্যে।

কিছুক্ষণ পরেই আকেলাসকে চিৎ করে ফেলে হারকিউলিস তাঁর বুকের উপর চড়ে বসলেন। জয় পরাজয় মুহূর্ত-পরে ঘোষিত হবে, ঠিক এমনি সময় আকেলাস রূপ পরিবর্তন করলেন। বিশাল এক সর্পের রূপ ধরে তিনি হারকিউলিসের বাহুচাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হারকিউলিস দুহাতের বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন সর্পরূপী আকেলাসের কণ্ঠ। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,—আমি যখন শিশু ছিলাম তখন তোমার মতো অজগরকে আমি দোলনায় শুয়ে মেরেছি। তা বুঝি জানোনা?

আকেলাস অবস্থা বুঝে আবার চেহারা বদলালেন। বিরাট ষণ্ডরূপ ধারণ করে এক ঝটকায় হারকিউলিসের হাত থেকে সরে

গিয়ে কয়েক পা পিছু হটে গেলেন। তারপর মাথা নিচু করে সুতীক্ষ্ণ দুই শিং উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর। এমনি ষাঁড়কে কাবু করাও হারকিউলিসের কাছে খেলা মাত্র। ক্রীট দ্বীপের ষাঁড়কে তিনি জয় করেছিলেন অক্লেশে। বিদ্যুৎগতিতে এক-পাশে সরে গিয়ে হারকিউলিস ষণ্ডরূপী আকেলাসের শৃঙ্গদ্বয় চেপে ধরলেন,—সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় তাঁর ঘাড় বেঁকিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। তাঁর হাতের বজ্রচাপে একটা শিং মট্ করে ভেঙে গেল্। ভগ্নশৃঙ্গ ধরাশায়ী ব্যর্থ আকেলাস যন্ত্রণায় আর হতাশায় ছটফট করতে লাগলেন শুধু।

রাজা ইনিউস পরমানন্দে হারকিউলিসের সঙ্গে কন্যা ডিয়ানিরার বিবাহ দিলেন। প্রেমময়ী লাবণ্যময়ী স্ত্রী লাভ করে হারকিউলিস ভাবলেন, তাঁর জীবনের দুঃখনিশার অবসান বুঝি এতোদিনে হোলো। তাঁর চির-উৎক্ষিপ্ত ভাগ্য এতোদিনে বুঝি স্বস্তির স্থির আশ্রয় লাভ করেছে।

নবোঢ়া পত্নী ডিয়ানিরাকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পথে হারকিউলিসের গতি রুদ্ধ হোলো ইভেনাস নদীর তীরে এসে। নদীতে তখন দুকূলপ্লাবী জোয়ার, ক্ষুরধার তরঙ্গ,—মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ ঘুর্নিপাক। পত্নীকে নিয়ে এই নদী তিনি পার হবেন কেমন করে? তাঁর একলার পক্ষে সাঁতার কেটে পার হওয়া কিছুই নয়, কিন্তু হাতের মুঠোয় ধরা ডিয়ানিরার কোমল হাতটি কেঁপে কেঁপে উঠছে যে!

নদীতীরে দাঁড়িয়ে হারকিউলিস ভাবছেন, এমন সময় নিসাস নামে এক অশ্ব-মানব সেণ্টর এসে তাঁর কাছ উপস্থিত হোলো। ইউরিম্যান্থাসে শূকর ধরার সময় সেণ্টরদের সঙ্গে হারকিউলিসের যে লড়াই হয়েছিল, সেই লড়াইতে এই নিসাসও ছিল,—ইভেনাস

নদী পার হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেদিন। সেই পলায়নের গ্লানি ভোলেনি।

অমায়িক সৌজন্যের ভান করে নিসাস হারকিউলিসকে বললে,—আপনি সাঁতার দিয়ে চলে যান, আমি আমার পিঠে করে আপনার স্ত্রীকে ওপারে পৌঁছে দিচ্ছি।

হারকিউলিস বিশ্বাস করলেন নিসাসের কথায়। তিনি তাঁর ধনুর্বাণ আর গদা ওপারে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর ঝাঁপ দিলেন জলে।

নদীর অপর তীরে পৌঁছে সবেমাত্র তিনি মাটি থেকে ধনুর্বাণ হাতে তুলতে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর কানে এল নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার। এই চকিত আর্তনাদে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখেন, নিসাস নদীর জলে পা পর্যন্ত ছোঁয়ায় নি। ডিয়ানিরাকে পিঠে নিয়ে নদীর পরপার ধরে সে ছুটে পালাচ্ছে।

বজ্রগর্জনে তস্কর নিসাসকে তিরস্কার করলেন হারকিউলিস। পরমুহূর্তে তাঁর অব্যর্থ বাণ ওপার থেকে ছুটে এসে সেণ্টরের বক্ষ বিদীর্ণ করল। নিসাস বুক থেকে তীরটা টেনে বার করামাত্র হাইড্রার বিষমিশ্রিত কালো রক্ত ঝলকে ঝলকে বার হয়ে তার গায়ের জামাটা ভিজিয়ে দিল।

মৃত্যুপথযাত্রী নিসাস শেষ প্রতিশোধ নিল হারকিউলিসের উপর। গায়ের রক্তমাখা জামাটা খুলে সে ডিয়ানিরার হাতে দিল। বললে,—আমি মরতে বসেছি আমার আপন পাপে। তার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ একটি উপকার আমায় করতে দাও। আমার এই মুমূর্ষু বক্ষের রক্ত কামনার রক্ত। এই রক্তমাখা জামাটি তোমার কাছে লুকিয়ে রাখো। যদি কখনো এমন দিন আসে যেদিন তোমার প্রতি তোমার স্বামীর বাসনা শিথিল হবে, সেদিন তোমার স্বামীকে এই জামাটি গোপনে পরিয়ে দিয়ো। দেখো, আমার রক্তের গুণে

স্বামীর পূর্ব অনুরাগ আবার তুমি ফিরে পাবে।

মন্দভাগ্যা ডিয়ানিরা নিসাসের পরিত্যক্ত সেই জামাটি আপন বস্ত্রের মধ্যে সঙ্গোপনে রক্ষা করল।

এগারো

টাইটান-পিতা ক্রোনাসকে হত্যা করে ও অন্য টাইটানদের অন্ধকার পাতালে বন্দী করে পরম সুখে অলিম্পাসে রাজত্ব করছেন জুপিটার ও অন্যান্য দেবগণ। স্বর্গ মর্ত পাতালে দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত, ত্রিভুবনে দেবতাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। মর্তভূমির মানুষ দেবগণের ক্রীড়াপুত্তলী।

কতো যুগ কেটে গেল,—একদিন দেবরাজ্যে বিপদের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। আদি পিতা ইউরেনাসের শেষ রক্তধারা একদা ঝরেছিল মাতা ধরিত্রীর দেহে,—সেই রক্ত থেকে মাতা ধরিত্রী প্রসব করেছিলেন আরো কটি সাজ্ঘাতিক সন্তান। এরা ভীমকায় দৈত্য,—সংখ্যায় চব্বিশ জন।

পাতালের অন্ধকার গহ্বরে নিত্যশৃঙ্খলিত টাইটান ভ্রাতাদের দুরবস্থার কথা তাদের দৈত্য ভ্রাতারা ভোলেনি। হঠাৎ একদিন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল দেববংশের বিরুদ্ধে,—তাদের যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ভেঙে পড়ল দেবরাজধানী অলিম্পাসের শিখরে।

দৈত্যদের এই অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন দেবগণ। অমানুষিক এই দৈত্যদের শক্তি। তারা মাটি থেকে বিরাট বিরাট পর্বতচূড়া উপড়ে নেয়, আর সেইসব পর্বতচূড়াকে ছুঁড়ে মারে অলিম্পাসের প্রতি লক্ষ্য করে। মার্সের রণোন্মাদনা, মিনার্ভার যুদ্ধকৌশল, ভালকানের অস্ত্রশস্ত্র,—সবকিছু তাদের ভীম দেহবলের কাছে হার মানে। পাহাড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা জুপিটারের বজ্রকে

ভোঁতা করে দেয়।

অলিম্পাসের পর্বতমূলে কাঁপন ধরাবার পর দৈত্যরা পাহাড়ের উপর পাহাড় সাজিয়ে তাই বেয়ে উঠে অলিম্পাস অধিকার করার তোড়জোড় শুরু করেছে। দেবগণের পরিত্রাণের আশা বুঝি আর নেই।

এহেন দুর্যোগের এক রজনীতে দেবরানী জুনো স্বপ্ন দেখলেন যে মর্তভূমি থেকে এক মহাবীর দেবতাদের দলে যোগ দিয়েছেন ও দেবগণকে বিজয়-সমরে উদ্বুদ্ধ করছেন। এই বীরের অঙ্গে সিংহের চর্ম, মাথায় সিংহমুখ শিরস্ত্রাণ। কে এই মর্তবীর? জুনোর ঈর্ষাকাতর অন্তরের নিত্যযন্ত্রণার মূর্ত প্রতীক হারকিউলিস।

দেবরানীর এই আশ্চর্য স্বপ্নকাহিনী শুনে এতো বিপদের মধ্যেও দেবরাজের মনে আনন্দ ও আশ্বাসের আভাস জাগল। পুত্র হারকিউলিসেব সাহায্য তিনি প্রার্থনা করলেন,—এই প্রার্থনার বাণী হারকিউলিসের কাছে বহন করে নিয়ে গেলেন দেবী মিনার্ভা।

হারকিউলিস যোগ দিলেন দেবগণের পক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে দেবদানবের লড়াইয়ের চেহারা ঘুরে গেল। দেবতাদের প্রাণে মুহূর্তে বীর্য ও বিশ্বাসের শক্তি সঞ্চারিত করলেন হারকিউলিস। মানুষ তিনি,—তিনি নিলেন দেবগণের নেতৃত্ব। ঘোষণা করলেন,—অলিম্পাসের শিখরের আড়ালে কাপুরুষের মতো লুকিয়ে থাকলে চলবে না,—দাঁড়াতে হবে দৈত্যদের মুখোমুখি। সম্মুখ-সমরে শত্রু বিনাশ করতে হবে।

হারকিউলিসের এই উদাত্ত আহ্বানে চমকিত হোলো অলিম্পাস, ধ্বংসের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা যাঁরা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলেন, তারা জয়াশার নব-উন্মাদনায় নেতার পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন স্বর্গীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। দাঁড়ালেন সূর্যদেব

অ্যাপোলো, রণদেবতা মার্স, বীর মার্কারি, চন্দ্রদেবী ডায়ানা, শক্তির অধিষ্ঠাত্রী মিনার্ভা। উদ্বুদ্ধ হলেন বজ্রপাণি জুপিটার। দেবরানী জুনো ও প্রেমদেবী ভিনাসও পিছিয়ে রইলেন না,—তাঁদের অমর সৌন্দর্যের মোহিনীলীলায় রণোৎসাহী দেবতাগণের উৎসাহ বর্ধন করতে সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। এমনকি প্রেমদেব কিউপিডও এসে বললেন, আমিও আছি সঙ্গে। এই ছাখো, আমার প্রেমের বাণ পরিত্যাগ করে ভালকানের কাছ থেকে তীক্ষ্ণ মৃত্যুতীর সংগ্রহ করেছি আমার তূণীরে।

প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হোলো। হারকিউলিসের প্রথম তীরে ভূপতিত হোলো দৈত্যদলের নেতা অ্যালসিওনিউস। কিন্তু মাতা ধরিত্রীর বরে মাটির উপরে অ্যালসিওনিউসের মৃত্যু নেই। দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে সে মাটিতে উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য হলেন হারকিউলিস। তখন মিনার্ভা এসে হারকিউলিসকে জানালেন মাতা ধরিত্রীর ঐ বরের কথা। কিন্তু হারকিউলিস এই দৈত্যবরের সামর্থ্যকে হার মানাতে জানেন। তিনি তুহাতে দৈত্যনেতাকে জাপটে ধরে তার গলা টিপে তাকে অচৈতন্য করে ফেললেন। তারপর তার বিরাট দেহটাকে মাথায় তুলে নিয়ে চললেন সমুদ্রতীরের অভিমুখে। মাটিতে যার মৃত্যু নেই, দেখা যাক সমুদ্রজলে সে মরে কি না। বাকি তেইশ জন দৈত্য হারকিউলিসের মূর্তি দেখে সভয়ে দূরে সরে গেল। মেদিনী কাঁপতে লাগল তাঁর পদদাপে। ঈজিয়ান সমুদ্র-তীরে পৌঁছে হারকিউলিস দৈত্যের দেহটা সবলে নিক্ষেপ করলেন সম্মুখে। বহু দূরে সমুদ্রের জলে পড়ল অ্যালসিওনিউসের দেহ। আর উঠল না।

অলিম্পাসে ফিরে এসে হারকিউলিস দেখেন, অন্য দৈত্যদের হাতে দেবতাদের দশা চরমে পৌঁছেছে। রাজ্য বুঝি যায়-যায়। দেববধূদের মর্যাদা পর্যন্ত দৈত্যদের হাতে বুঝি আর থাকে না।

লড়াই করছেন একমাত্র দেবী মিনার্ভা। তাঁকে এড়িয়ে পর্ফিরিয়ন নামে এক দৈত্য সহসা আক্রমণ করল দেবরানী জুনোকে। উন্মত্ত লালসায় উন্মাদ হয়ে সে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করল,—ছিন্নভিন্ন করল তাঁর বসন।

ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হলেন হারকিউলিস। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি, সেই হুঙ্কারে চমকে উঠে দুরাত্মা পর্ফিরিয়ন পিছন ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় ভেঙে পড়ল হারকিউ-লিসের গদা। অকল্পনীয় অপমানের হাত থেকে দেবসম্রাজ্ঞীকে রক্ষা করলেন হারকিউলিস,—সার্থক হোলো তাঁর 'হেরার সম্মান' নাম।

হারকিউলিসকে কাছে পেয়ে দেবতারা আবার উৎসাহিত হলেন,—নূতন উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন তাঁরা। কিন্তু হারকিউলিসের তখন ক্ষিপ্ত-উন্মত্ত অবস্থা। কোনো সাহায্যের গ্রাহ্য তাঁর নেই। প্রধান প্রধান দৈত্যদের তিনি একা হাতে বধ করলেন। বাকি যারা রইল, তারা অলিম্পাস শিখর ছেড়ে নিম্ন-ভূমিতে পলায়ন করল। জুপিটার, মার্স ও মার্কারি তাদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের প্রত্যেককে ধ্বংস করলেন। নির্মূল হোলো দৈত্যকুল।

বারো

বহু বৎসর কেটে গেছে। শ্রেষ্ঠ বীর রূপে হারকিউলিসের নাম ছড়িয়ে গেছে ত্রিভুবনে। তাঁর বীর্যবলে নির্ভয় মানবসমাজ,—নির্ভয় দেবগণ। তিনি নিজেও পেয়েছেন জীবনের চরিতার্থতা,—খ্যাতি, শ্রদ্ধা, শান্তি। ফিরে পেয়েছেন সংসার,—প্রেমময়ী পত্নী আর সুন্দর সন্তানসন্ততি।

একটি প্রতিজ্ঞা তখনো রক্ষা করা হয়নি তাঁর। শাস্তি দেওয়া হয়নি বিশ্বাসঘাতক ইউরিটাসকে। এইবার এই প্রতিজ্ঞা পালনের সময় এসেছে। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সমভিব্যাহারে ইকালিয়া আক্রমণ করলেন হারকিউলিস।

তীরন্দাজ-প্রবর ইউরিটাস ও তাঁর পুত্রদের ধর্মুর্যুদ্ধে আহ্বান করলেন হারকিউলিস। এবার প্রতিযোগিতা নয়,—যুদ্ধ। নিহত হলেন রাজা ইউরিটাস। হারকিউলিসের সৈন্যদল নিষ্ঠুর আনন্দে লুণ্ঠন করল রাজ্য। রাজকুমারী ইয়োলকে বন্দিনী করে তিনি সঙ্গে নিয়ে চললেন।

ঘরে ফেরার পথে ঈটা পর্বতের সানুদেশে এসে হারকিউলিস বিজয়দেবতা পিতা জুপিটারের পূজা-আয়োজন করলেন। ভৃত্য লিচাসকে তিনি পত্নী ডিয়ানিরার কাছে পাঠালেন নূতন বস্ত্রের জন্যে, যে বস্ত্র পরে তিনি দেবপূজা করবেন।

বিজয়-সংবাদে ডিয়ানিরার মনে কিন্তু আনন্দের বান ডাকল না। ডিয়ানিরা জানত যে ইকালিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করবার জন্যে একদা তার স্বামী পাগল হয়েছিলেন। সেই রাজকুমারী ইয়োল আজ তার স্বামীর বন্দিনী। স্বামী তাকে বধ করেন নি, মুক্তি দেন নি, সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন স্বগৃহে। কেন? কেন কেন এ যুদ্ধে গিয়েছিলেন তার স্বামী? কেন এতোদিন পরে তার ভাগ্যে স্বামীসুখহৃতির স্পষ্ট ছায়া?

ডিয়ানিরা ভাবল ইয়োলকে পেলে আর তাকে হারকিউলিস ভালোবাসবেন না। স্বামীসোহাগিনী সে, স্বামীর একনিষ্ঠা ছায়া-বর্তিনী সে,—এবার বুঝি ব্যর্থ হবে তার জীবন। হিংসা দিয়ে নয়, ঈর্ষা দিয়ে নয়,—কী দিয়ে সে স্বামীকে টেনে রাখবে তার কাছে, কোন্ মন্ত্রে সে বাঁধবে তার প্রেমাস্পদ ভর্তাকে?

মনে পড়ল অশ্বমানব নিসাসের সেই রক্তাক্ত পোশাকটার কথা। সেটাকে সে পাঠিয়ে দিল লিচাসের হাতে।

সেই পোশাক গায়ে দিলেন হারকিউলিস, সেই পোশাক,—যার সর্বত্র লেগে রয়েছে হাইড্রার মৃত্যু-বিষ। যজ্ঞবেদীমূলে আগুন জ্বেলে পিতা জুপিটারের উপাসনা আরম্ভ করলেন হারকিউলিস।

হঠাৎ যেন প্রচণ্ড অগ্নিজ্বালা শুরু হোলো বক্ষে,—আচম্বিতে সেই জ্বালা ছড়িয়ে গেল তাঁর সর্ব অঙ্গে। প্রচণ্ড আত্মসংযমে দেহের জ্বালাকে রুদ্ধ করে তিনি উপাসনা করে যেতে লাগলেন। কিন্তু জ্বালা শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে। সেই জ্বালা যেন প্রতি রোমকূপের মধ্য দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে,—চর্ম থেকে মাংসের মধ্যে, মাংস থেকে অস্থিতে, অস্থি থেকে মজ্জায়। আর সহ্য হয় না,—বন্ধ হোলো পূজা, স্তব্ধ হোলো মন্ত্রোচ্চারণ। যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে তিনি চীৎকার করতে লাগলেন,—সেই আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ঈটা পর্বতগাত্রের অরণ্যে অরণ্যে।

গা থেকে সেই জামা ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন হারকিউলিস। কিন্তু জামা তখন তাঁর দেহ কামড়ে ধরেছে। নখ দিয়ে টানতে লাগলেন জামা, নখের টানে ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠতে লাগল গায়ের চামড়া, খাবলা খাবলা মাংস। শিরা-প্রশিরা আর বিরাট বিরাট পেশী প্রকাশ পেতে লাগল উলঙ্গ হয়ে, ফুটে উঠতে লাগল পঞ্জরের বিশাল বিশাল অস্থি। হাইড্রার সাঙ্ঘাতিক বিষ ততোক্ষণে তাঁর রক্তে গিয়ে পৌঁছেছে,—টগবগ করে ফুটছে সেই রক্ত উত্তপ্ত মত্ততায়। হৃৎপিণ্ডের অন্ধকারে কে যেন জ্বেলে দিয়েছে চিতাকুণ্ড,—তার লেলিহান অগ্নিশিখায় ফুটছে দেহকটাহের প্রতিটি রক্তবিন্দু!

বিরাট এক ষণ্ডের ঘাড়ে তীক্ষ্ণ বর্শা বিঁধলে সে যেমন ছুটে বেড়ায় তেমনি কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলেন

হারকিউলিস। সমস্ত অরণ্যভূমি মথিত হতে লাগল তাঁর পদদাপে, থর-থর কাঁপতে লাগল ঈটা পর্বতের শিখর,—তাঁর বজ্রকণ্ঠের আর্তনাদে শিহরিত হোলো আকাশ। নিসাসের রক্তবস্ত্রের অভিশাপ থেকে তাঁর মুক্তি নেই।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল ভৃত্য লিচাস পাহাড়ের এক কোণায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন হারকিউলিস,—লিচাস, তুই না আমার প্রভুভক্ত ভৃত্য ? তুই না নিজে হাতে এনেছিলি এই পোশাক ?

লিচাসের কোনো কথা বলবার আর অবসর হল না। ছু-হাতে তাকে ধরে মাথার উপর কয়েকবার ঘুরিয়ে হারকিউলিস তাকে প্রচণ্ড বেগে শূন্যমার্গে ছুঁড়ে দিলেন। লিচাসের দেহের সমস্ত রক্ত মুহূর্তের আতঙ্কে জমাট বেঁধে গিয়েছিল,—আকাশ থেকে নিচে পড়বার সময়ে দেহটা প্রস্তরপিণ্ডে পরিণত হোলো,—সেই পাথর গিয়ে পড়ল ইউবিয়ান সমুদ্রের জলে।

ডিয়ানিরার কানে গিয়ে পৌঁছল তার স্বামীর অবস্থার কথা। স্বামীর ভালোবাসা রক্ষা করতে চেয়েছিল সে,—আপন হাতে স্বামীর মৃত্যুর আভরণ সে পাঠিয়েছে। অলিম্পাসের দেবতাদের নাম ধরে বিলাপ করে সে বললে,—তোমরা জানো,—আমার স্বামীর মৃত্যু আমি চাইনি, আমি চেয়েছিলাম তাঁর ভালোবাসা।

তারপর তীক্ষ্ণ তরবারির সামনে বুক পেতে আত্মহত্যা করল পতিঘাতিনী সতী।

আর বাকি নেই। শেষ হয়েছে জীবনের যুদ্ধ। যুদ্ধই হারকিউলিস করেছেন সারাজীবন ধরে—ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যুদ্ধ জুনোর অভিশাপের বিরুদ্ধে। সেই যুদ্ধে দেহমন তাঁর জ্বলছে। নির্বাপিত হোক তার দাহন।

পিতা জুপিটারের অর্চনার জন্যে যে যজ্ঞবেদী রচনা করেছিলেন তার পাশে এসে তিনি দাঁড়ালেন। হোমশিখা নির্বাপিত, শুধু এক ক্ষীণ ধূমরেখা।

বেদনাকুঞ্চিত বিরাট ললাট আকাশের দিকে তুলে তিনি ভগ্ন অস্ফুট কণ্ঠে বললেন,— মাতা জুনো, কেন তুমি আমাকে স্তন্যদান করেছিলে! কেন করেছিলে অমরত্বের অধিকারী? তার প্রতিদান আমি দিয়েছি দানবের কলুষ কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করে। তবু তুমি শান্ত হওনি? তবু তোমার জিঘাংসা চরিতার্থ হয়নি? তবে ফিরিয়ে নাও তোমার অনিচ্ছুক আশীর্বাদ। সম্পূর্ণ করো তোমার ইচ্ছা। মৃত্যু দাও আমাকে।

সেই ললাট নত করে ধূসর বেদীমূলে হারকিউলিস শেষবারের মতো প্রণাম করলেন দেবরাজ জুপিটারকে। তারপর পর্বতসানুর বিরাট বিরাট বৃক্ষকাণ্ড উপড়িয়ে এনে পাশাপাশি রেখে সাজালেন চিতাশয্যা। সেই স্বহস্তরচিত চিতার উপর তাঁর চিরজীবনের সাথী সিংহচর্মটি পাতলেন। উপাধানের পরিবর্তে শিয়রের কাছে রাখলেন তাঁর গদা। অনন্ত আকাশের দিকে মুখ করে তিনি সেই চিতায় শায়িত হলেন। সমবেত সাথীদের বললেন,—আগুন দাও চিতায়।

কে দেবে আগুন? কে করবে এমন নিষ্ঠুর কাজ? এগিয়ে এলেন ফিলক্‌টেটিস। কৃতজ্ঞ হারকিউলিস ফিলক্‌টেটিসকে উপহার দিলেন তাঁর অজেয় ধনুর্বাণ।

চিতা জ্বলে উঠল। সেই অগ্নিতে বুঝি তাঁর অঙ্গের বিষাগ্নি প্রশমিত হোলো। প্রশান্ত মুখ, ক্লান্ত চোখদুটি তৃপ্তিতে বন্ধ হয়ে এল। লেলিহান অগ্নিশিখার দল রণক্লান্ত মানবশ্রেষ্ঠ বিজয়ীর অঙ্গ ঘিরে মাল্যের শোভা রচনা করল।

আকাশ থেকে দেবতারা এই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন।

জুপিটার বললেন,—ভয় নেই, দেবমানবের রক্ষাকর্তার মৃত্যু নেই। হারকিউলিসের যে অংশ মরণশীল তা দাহ হবে, যে অংশ অমর তাকে আমি স্থান দেব আমার অলিম্পাসে।

আকাশ থেকে বজ্র হানলেন জুপিটার। সমস্ত চিতা একসঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেই দগ্ধ অঙ্গার-ভস্ম থেকে জেগে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয়ী নূতন হারকিউলিস বৃহত্তর দেহ সমর্থতর শক্তি মহত্তর হৃদয় নিয়ে। বজ্রবিদ্যুতের আঁকাবাঁকা পথে আকাশের মেঘাবরণের মধ্য দিয়ে নেমে এল জুপিটারের স্বর্ণরথ। সেই রথ মহামৃত্যুঞ্জয় হারকিউলিসকে বহন করে নিয়ে গেল স্বর্গরাজ্যে। অলিম্পাস দেবসভায় স্থাপিত হোলো তাঁর চিরন্তন আসন।

থেসিউস

এক

ট্রোয়েজেন রাজকুমারী ইথরার মুখে হাসি নেই। স্বামী তার এথেন্সের রাজা ঈজিউস। কিন্তু স্বামীগৃহের মুখ সে দেখেনি। কোলে তার সর্বলক্ষণযুক্ত সুন্দর শিশু। এই শিশুই বা পিতৃমুখ দেখবে কবে ?

নবযৌবনা ইথরা চিরকুমারীর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল। তার উদ্ভিন্ন-কৌমার্যের এক ব্যর্থ প্রেমের বিনিময়ে এই সুকঠিন ব্রত। বিবাহ সে করবে না, কোন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না তার যৌবন। বরবর্ণিনী রাজনন্দিনী একাকী অতিবাহিত করবে ব্রতচারিণীর জীবন।

কন্যার এই প্রতিজ্ঞায় ট্রোয়েজেনরাজ পিথিউস মর্মাহত। প্রার্থনা করেন তিনি দেবী ভিনাসের কাছে,—তাঁর করুণা-স্পর্শে মুদিত শতদল যেন উন্মোচিত হয়।

করুণা করলেন। দেবী ভিনাস। সারোনিক উপসাগর অতিক্রম করে এথেন্সের রাজা ঈজিউস একদা ট্রোয়েজেনে এলেন,—অতিথি হলেন রাজা পিথিউসের। ঈজিউসকে দেখে সহসা ইথরার মন ভুলল, ক্ষণকালের দুর্বলতায় সে আত্মসমর্পণ করল রাজ-অতিথির কাছে।

কিন্তু তবু সে আশ্রয় নিল না স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনে।

পিতৃরাজ্যেই সে রয়ে গেল। বিদায় নেবার প্রাক্কালে ঈজিউস তাঁর গজদন্তনির্মিত খাপ-সমেত তরবারিটি এক বিরাট পাথরের নিচে চাপা দিয়ে ইথরাকে বললেন,—যদি আমাদের কোনো পুত্র হয়, সযত্নে তাকে তুমি পালন কোরো। সে পুত্র বড় হয়ে যেদিন নিজের হাতে এই পাথর তুলে আমার তরবারিটি নিতে পারবে, সেদিন তাকে এথেন্সে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

সেই পুত্রের নাম থেসিউস। যৌবনে যোগিনী ম্লানমুখী ইথরার নয়নমণি। দিনে দিনে বাল্য কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনসীমায় যখন অতিক্রান্ত হলেন থেসিউস, তখন তাঁর চেয়ে বীর্যবান, বুদ্ধিমান সুপুরুষ কিশোর সারা ট্রোয়েজেন রাজ্যে দ্বিতীয় নেই। নেপচুনদেবের মন্দিরপ্রান্তে এক ওষধিগুল্ম-কুঞ্জের কাছে ইথরা ছেলেকে নিয়ে গেলেন। বললেন,—এই যে পাথরটা এখানে পড়ে রয়েছে, এটাকে নড়াতে পারিস ?

অবলীলাক্রমে পাথরটিকে দুহাতে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন থেসিউস,—তার নিচে থেকে উদ্ধার করলেন ঈজিউসের তরবারি।

এ তরবারি কার মা ?

এথেন্সরাজ ঈজিউসের। তিনিই তোমার পিতা। তুমি বড়ো হয়েছ। পিতার অস্ত্র তুমি হাতে নিয়েছ। এবার তুমি এথেন্সে যাও। রাজার কাছে গিয়ে আপন পুত্র-পরিচয় ঘোষণা করো।

জাহাজ সাজালেন মাতামহ পিথিউস। কিন্তু নিরুপদ্রব সমুদ্র-পথে এথেন্স যাত্রা করতে থেসিউস নারাজ। বীর হারকিউলিসের আত্মীয় তিনি, হারকিউলিস তাঁর আদর্শ। দুর্গম স্থলপথে তিনি যাবেন, অতিক্রম করবেন বিপদসঙ্কুল অরণ্য-পর্বত। যে পথে পা দিতে সকলে ভয় পায়, সেই পথকে একলা নির্ভয় করবেন তিনি

সাহসে আর বলিষ্ঠতায়।

সমুদ্রতীর ধরে কিছুদূর যেতে যেতে ইপিডরাস নামক স্থানে পেরিফেটিস নামে এক দানবের সম্মুখীন হলেন থেসিউস। পেরিফেটিস বিশ্বকর্মা ভালকানের পুত্র, ভালকানেরই মতো সে খঞ্জ। হাতে তার বিরাট এক গদা, সেই গদাঘাতে সে নিরীহ পথচারীদের বধ করে।

ধীরমনা থেসিউস অকারণ কারো সঙ্গে কলহ বিবাদ করতে চান না। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে তাঁর দ্বিধা নেই। থেসিউসকে দেখামাত্র দানব তার গদা উঁচিয়ে তেড়ে এল। থেসিউস ডান হাতের এক ঝটকায় তার হাত থেকে গদাটা কেড়ে নিলেন, তারপর আততায়ীর নিজেরই গদার একটি আঘাতে তার বিরাট মাথাটা চূর্ণ করে দিলেন। দানবের বিশাল গদাটা বড়ো পছন্দ হোলো। সেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে থেসিউস অগ্রসর হলেন।

সমুদ্রতীর ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে হাঁটতে থেসিউস এসে পৌঁছলেন করিন্থ যোজকে। শীর্ণ ভূমিরেখা, দুপাশে সমুদ্র। এখানে ঘন অরণ্যের মধ্যে বাস করে সিনিস নামে এক মহা দস্যু। শুধু দস্যু বলেই সে পরিচিত নয়, রোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার জন্যে সর্ব অঞ্চল জুড়ে তার কুখ্যাতি। প্রচণ্ড তার দেহবল, বড়ো বড়ো পাইন গাছের চূড়া ধরে সে মাটিতে শুইয়ে ফেলতে পারে। নিরীহ পথচারীকে হত্যা করবার প্রক্রিয়া তার বিচিত্র। পাশাপাশি দুই পাইন গাছের শীর্ষ সে টেনে নামায়, তারপর দুই গাছের নোয়ানো মাথার সঙ্গে সে পথিকের দু-হাত কিংবা দু-পা বেঁধে দেয়। তারপর সে গাছদুটোকে মুক্তি দেয়। দুই গাছ একসঙ্গে ভীমবেগে আকাশে মাথা তোলে, আর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বন্দীর শরীর।

থেসিউসকেও সিনিস ধরল। কিন্তু থেসিউস অন্যান্য সন্ত্রস্ত পথিকদের মতো বিনা প্রতিবাদে দস্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করবার

পাত্র নয়। সিনিসকে তিনি মল্লযুদ্ধে পরাজিত করলেন। তারপর এতোদিন সিনিস যেভাবে তার নির্দোষ বন্দীদের বধ করেছে ঠিক সেইভাবেই তাকে বধ করলেন। করিন্থ যোজক পথচারীদের পক্ষে নির্বিঘ্ন হোলো এখন থেকে।

এবার সমুদ্রতীর ধরে ধরে পূর্ব দিকে চললেন থেসিউস। বাম-দিকে মিগারা নগরী, দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের উপর সালামিস দ্বীপ। এইখানে এক পাহাড়ের চূড়ায় বাস করত আর-একজন সাঙ্ঘাতিক দস্যু। পাহাড়ের চূড়ায় বসে সে চারদিক লক্ষ্য করত। কাছাকাছি কোনো বিদেশী পথিক দেখলেই সে তাকে গিয়ে ধরত। তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে পদাঘাতে নিক্ষেপ করত সমুদ্রজলে। দস্যুর নাম স্কাইরন। থেসিউস নির্বিবাদে স্কাইরনের হাতে নিজেকে ধরা দিলেন। সে তাঁকে জাপটে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে লাগল। তারপর যেই চরম পদাঘাত হানতে সে উদ্যত হোলো, অমনি থেসিউস তার ডান পা-টা চেপে ধরলেন। সেই পা ধরে স্কাইরনকে তিনি বন্-বন্ করে ঘোরাতে লাগলেন মাথার উপর। তারপর হঠাৎ শিথিল করলেন মুষ্টি। দূর সমুদ্রজলে দস্যু স্কাইরনের হোলো সমাধি।

অ্যাটিকা অঞ্চলে পোঁছে আর-এক মহা দস্যুর সম্মুখীন হলেন থেসিউস। এর নাম প্রোক্রাস্টেস, সিনিসের পিতা। মহা বর্বর, বর্বরতায় সে তার ছেলেকে হার মানায়। তার কবলে যে লোক পড়ে, সে তাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা খাটে শোয়ায়। খাটটা যদি দৈর্ঘ্যে তার বন্দীর চেয়ে বড়ো হয়, তাহলে সে বন্দীকে টেনে বড়ো করে। খাট যদি ছোট হয়, তাহলে সে খাটের মাপে বন্দীর পা দুটো কুচিয়ে কুচিয়ে কাটে। পুত্রের হত্যাকারীকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে সে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। থেসিউস শুরু করলেন মল্লযুদ্ধ। বাঘেরই মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী এই প্রোক্রাস্টেস,

পাহাড়ের মতো বিরাট তার কালো দেহ। শক্তিতে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারলেও কূট মল্লবীর থেসিউস কৌশলে তাকে পরাজিত করলেন। তাকে উপুড় করে ফেলে পিঠের উপর এমন এক নিপুণ চাপ দিলেন যে তার শিরদাঁড়াটা মট্ করে ভেঙে গেল। তারপর অশক্ত প্রোক্রাস্টেসকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন তার সেই খাটে। খাটের একদিকে তার পাদুটো আঁটল, কিন্তু খাট ছাড়িয়ে মাথাটা ঝুলে পড়ল বাইরে। পরম আনন্দে তার মাথাটা থেসিউস কাটলেন।

পথের আরো অনেক বিপদ জয় করে শেষ পর্যন্ত থেসিউস উপস্থিত হলেন পিতৃরাজধানী এথেন্সে। গ্রীসের পূর্বসমুদ্রতীরবর্তী বিস্তীর্ণ স্থলপথ তিনি বিপন্মুক্ত করেছেন। সেই সংবাদ এথেন্স-বাসীরা শুনেছে। তারা ভিড় করে এল এই অপরিচিত বিদেশী বীরকে দেখতে। জয়ধ্বনি করতে লাগল তারা।

দুই

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এথেন্স নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাটিকার প্রাচীন রাজা সিক্রপ্স। সমুদ্রের দেবতা নেপচুন অ্যাটিকা অঞ্চলে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন। তিনি এথেন্সের অ্যাক্রপলিস শিখরে প্রোথিত করেছিলেন তাঁর রাজদণ্ড। সেই রাজদণ্ড ভূমি ভেদ করে সমুদ্র স্পর্শ করেছিল, সৃষ্টি করেছিল এক লবণাক্ত প্রস্রবণের। কিন্তু মর্তভূমি অধিকারের এই প্রচেষ্টায় নেপচুনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন দেবী মিনার্ভা। তিনি অ্যাটিকা রাজ্যকে উপহার দিলেন বিখ্যাত অলিভলতা। অলিভলতা ও অলিভ হল মর্তবাসীর পরম প্রিয়। এই দানের কাছে নেপচুনের

লবণাক্ত জলধারার দান নিতান্ত তুচ্ছ। জুপিটারের বিচারে নেপচুন পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হলেন।

রাজা সিক্রেপ্‌স মিনার্ভাকে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বরণ করলেন। দেবী অ্যাথেনির নামে প্রধান নগরীর নামকরণ করলেন এথেন্স।

রাজা ঈজিউস সিক্রপ্‌সের পৌত্র। তাঁর রাজত্বকালে অ্যাটিকা চার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈজিউস হয়েছেন এথেন্সের রাজা। তাঁর অন্য তিন ভ্রাতা মিগারা, ইউবিয়া ও দক্ষিণ অ্যাটিকার পৃথক পৃথক অধীশ্বর। অপর ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠ ঈজিউসের প্রতি সদা-ঈর্ষান্বিত। তাদের গোপন চক্রান্ত-ভয়ে সদা দুশ্চিন্তিত ঈজিউস। তাছাড়া আরো এক মহা দুঃখ ইজিউসের মনে। কী হবে রাজ্যরক্ষার নিত্য প্রয়াসে? কে ভোগ করবে দেবী মিনার্ভার স্নেহধন্য এই এথেন্স রাজ্য? তিনি যে নিঃসন্তান!

পর-পর দুবার বিবাহ করেছিলেন ঈজিউস। কিন্তু কোন স্ত্রীই তাঁকে সন্তান উপহার দেয় নি। জেসন-পরিত্যক্তা মিডিয়াকে তিনি সাগ্রহে নিজ রাজপুরীতে বরণ করেন। অলৌকিক শক্তির অধি-কারিণী মিডিয়া। প্রার্থিত বংশধর হয়ত সে তাঁকে উপহার দেবে, এই আশায় ঈজিউস মিডিয়াকে বিবাহ করেছেন। ষোল বৎসর পূর্বেকার ট্রোয়েজেন-ভ্রমণের কাহিনী তিনি বিস্মৃত হয়েছেন, কবে মন থেকে মুছে গেছে সেখানকার রাজকুমারীর সঙ্গে স্বল্পকালের প্রেম-আলাপনের স্মৃতি। সন্তান-বুভুক্ষু ঈজিউস জানেন না যে ইথরা পুত্রসন্তান প্রসব করেছিলেন এবং সেই পুত্র এখন যৌবন ও কীর্তির সিংহদ্বারে উপনীত।

মিডিয়াও ইতিমধ্যে তৃপ্ত করেছে ঈজিউসের এতোদিনের বাসনা। ঈজিউসের ঔরসে তার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে।

থেসিউস এসে উপস্থিত হলেন এথেন্সের রাজপ্রাসাদে। রাজা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু মায়াবিনী মিডিয়া তার অন্তর্দৃষ্টিবলে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল আগন্তুকের পরিচয়। ঈর্ষায় দুশ্চিন্তায় মুখ কালো হয়ে গেল তার। এই মহাবীর অতিথি তারই সপত্নীপুত্র, তার স্বামীর প্রথম সন্তান!

রাজা ঈজিউসকে আড়ালে ডেকে মিডিয়া জানালো,—এই মহাবলশালী আগন্তুকের উদ্দেশ্য ভালো নয়। নিশ্চয়ই এসেছে কোনো দুরাত্মা দূরাত্মীয়ের খল দূতরূপে। এসেছে রাজ্যে আগুন জ্বালাবার দুরভিসন্ধি নিয়ে। দেখছ না, প্রজাদের মন কেমন করে ভুলিয়েছে? শোনোনি—পথে-পথে অজানা আগন্তুকের জয়ধ্বনি?

মিডিয়ার ষড়যন্ত্রে ঈজিউস পা দিলেন। পূর্বদেশীয় অপূর্ব পোশাকে সজ্জিত হয়ে সামনে এসে মোহন কটাক্ষে থেসিউসকে অভ্যর্থনা করে মিডিয়া তাঁর সামনে ধরল রক্তিম পানপাত্র। সেই পাত্রে সুমিষ্ট সুরার সঙ্গে মেশানো আছে মারাত্মক বিষবিন্দু।

নিরুদ্বেগ থেসিউস সেই মৃত্যুপাত্র সবে ওষ্ঠপ্রান্তে তুলেছেন, এমন সময় হঠাৎ ঈজিউসের দৃষ্টি পড়ল তাঁর কটিদেশে বিলম্বিত তরবারিটির দিকে।

এক ঝটকায় তিনি থেসিউসের হাতের পাত্রটি মাটিতে ফেলে দিলেন। শ্বেত-মর্মর হর্ম্যতল কালো হয়ে গেল বিষের প্রভাবে।

চীৎকার করে উঠলেন ঈজিউস,—কে তুমি? কী তোমার পরিচয়?

হর্ম্যতলের বিষ-কালিমার দিকে একবার তাকালেন থেসিউস। তারপর কোমরে বাঁধা গজদন্ত-শোভিত খাপ থেকে পিতার তীক্ষ্ণ তরবারিটি খুলে বললেন,—আমি আপনার পুত্র,—ট্রোয়েজেন-রাজ পিথিউস আমার মাতামহ।

মুহূর্তের জন্যে রক্ষা পেল থেসিউসের প্রাণ। পিতা ঈজিউস

তাঁকে দুহাতে বক্ষে টেনে নিলেন।

আর পালালো মিডিয়া। জেসন ও আর্গোনটদের সঙ্গে কলচিস রাজকুমারী এসেছিল গ্রীস দেশে। এবার জন্মের মতো গ্রীস পরিত্যাগ করে গেল কুহকিনী।

পরদিন প্রভাতে অ্যাক্রপলিসের রাজসভায় রাজা ঈজিউস তাঁর প্রজাবৃন্দকে আহ্বান করলেন। সেই সভায় সর্বসমক্ষে তিনি থেসিউসকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করলেন। আনন্দে উৎসবে মত্ত হোলো দেশবাসী। মিনার্ভার মন্দিরে যুবরাজ থেসিউসের নামে পূজারতি হোলো সপ্তদিবস ধরে।

তিন

সিডন রাজকুমারী ইউরোপাকে বৃষরূপে হরণ করেছিলেন দেবরাজ জুপিটার। একদিন বসন্ত-প্রভাতে প্রাসাদ উদ্যানে সখিগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করছেন রাজকন্যা ইউরোপা। প্রত্যেকের হাতে একটি করে স্বর্ণময় পুষ্পপাত্র। কেউ পুষ্পচয়ন করছে, কেউ সাজি সাজাচ্ছে, কেউ আরম্ভ করেছে মাল্য রচনা।

দক্ষিণ সমীর উতলা করল অলিম্পাসরাজকে। ইউরোপাকে দেখে তিনি বিমুগ্ধ হলেন। পেতেই হবে ঐ কন্যাকে। কিন্তু জুনোকে ভয় করতে তিনি অভ্যস্ত। বৃষরূপ ধারণ করে তিনি উদ্যান-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হলেন।

শাদা ধবধবে বৃষটির চেহারা, মাথার ছোট্ট-ছোট্ট শিং দুটি রুপোলি। কালো গভীর চোখদুটিতে বশ্যতার কোমলতা নিয়ে বৃষটি এসে ঠিক ইউরোপার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। ইউরোপা আর তার সখীরা খেলা করতে লাগল বৃষটির সঙ্গে। হাত

ঝুলিয়ে দেয় তার গলায়, আদর করে তার পিঠে, ফুলের মালা পরিয়ে দেয় তার শৃঙ্গে। আদরে আদরে চোখ বুজে এল বৃষটির। সে রাজকন্যার পায়ের কাছে বসে পড়ল। খেলাচ্ছলে ইউরোপা তার পিঠে চড়ে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে এ কী ভয়ানক কাণ্ড! ইউরোপাকে পিঠে নিয়ে বৃষ ছুটতে লাগল তীরবেগে। বৃষের শিং দুটি দুহাতে চেপে ধরে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে থাকে ইউরোপা। চলন্ত বৃষের পিঠ থেকে নামতে চেষ্টা করলে মাটিতে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে তার দেহ। ছুটতে ছুটতে বৃষ এসে পৌঁছল সমুদ্রতীরে, তারপর এগিয়ে চলল তরঙ্গের উপর দিয়ে। সাগরকন্যারা শঙ্খ বাজিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সামনে সামনে, বৃষের চরণ স্পর্শ করে প্রতিটি তরঙ্গ বুঝি ধন্য হোলো।

ভয়ার্ত অর্ধ-অচৈতন্য রাজকুমারী ইউরোপাকে সমুদ্রপারে ক্রীট দ্বীপে হরণ করে আনলেন বৃষরূপী জুপিটার। গ্রীস দেশের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত এই ক্রীট দ্বীপ দেবরাজের বড়ো প্রিয়। পিতা ক্রোনাসের ভয়ে জননী রিয়া যখন সদ্যোজাত শিশু জুপিটারকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, তখন মাতা ধরিত্রীর স্নেহচ্ছায়ায় এই ক্রীট দ্বীপে বড়ো হন জুপিটার।

দেবরাজ জুপিটারের বাসনা পূর্ণ হোলো। ক্রীটের বিখ্যাত রাজা মাইনস ইউরোপার গর্ভজাত জুপিটারের পুত্র। অসীম তাঁর রাজক্ষমতা, অতুল তাঁর রাজ-ঐশ্বর্য। তাঁর রাজধানীর নাম নসাস। মহাবৈভবমণ্ডিত নসাস নগরীর কেন্দ্রস্থলে মাইনসের আকাশচুম্বী রাজপুরী।

থেসিউসের এথেন্সে পদার্পণ করার কয়েক বৎসর আগেকার কথা। ক্রীটের রাজপুত্র ঈজিউসের অতিথি রূপে এথেন্সে বেড়াতে

এসে ঘটনাচক্রে প্রাণ হারান। পুত্রের মৃত্যুশোকে উন্মাদ রাজা মাইনস এথেন্সে আক্রমণ করেন ও পরাজিত রাজা ঈজিউসকে এক জঘন্য অপমানকর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেন। প্রতি নবম বৎসরে এথেন্সবাসী সাতজন তরুণ ও সাতজন তরুণীকে উপঢৌকন রূপে ক্রীট রাজ্যে পাঠাতে হবে। মাইনস-পুত্র বৃষমানব দানব মিনোটরের খোরাক হবে তারা। এথেন্সরাজ সেই কুৎসিত সন্ধিসর্ত পালন করে আসছেন।

কয়েক মাস পরেই উপঢৌকন পাঠাবার সময় এল। ভাগ্য-পরীক্ষা করা হোলো যুবক যুবতীর। বিদেশে প্রাণবলি দেবার জন্যে সাতজন তরুণ ও সাতজন তরুণী নির্বাচিত হোলো। দলের কনিষ্ঠতম তরুণটিকে সরিয়ে দিয়ে থেসিউস ঘোষণা করলেন, তিনি যাবেন ক্রীটে।

শিউরে উঠলেন রাজা ঈজিউস। দেবতার পরম অনুগ্রহে এতো প্রতীক্ষার পর তিনি বাঞ্ছিত পুত্র পেয়েছেন,—সেই পুত্র তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে? থেসিউসকে তিনি নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন বারংবার। দেশবাসীরাও এসে বাধা দিল তাঁর উদ্দেশ্যে। কিন্তু থেসিউস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বললেন,—ঐ মিনোটরকে যদি আমি বধ করতে পারি, তাহলে চিরদিনের জন্য আমরা পাব পরিত্রাণ। তবেই মোচিত হবে পিতৃভূমির চিরকলঙ্ক। আমি যাবই।

বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ল সমুদ্রে। জাহাজের পালের রং কালো। থেসিউস বললেন পিতাকে,—শাদা রঙের পালও আমি নিয়েছি সঙ্গে। যদি মিনোটরকে জয় করে ফিরতে পারি, তাহলে শোকের এই কালো রং নয়, বিপন্মুক্তির শাদা পাল শোভা পাবে জাহাজে।

ক্রীট যাত্রার প্রাক্কালে থেসিউস ডেল্‌ফির মন্দিরে গিয়ে অ্যাপোলোদেবের ভবিষ্যৎবাণী প্রার্থনা করেছিলেন। ডেল্‌ফির পুরোহিত বলেছিলেন,—ভয় নেই। এ যাত্রায় প্রেমদেবী ভিনাসের প্রার্থনা করো, ভিনাসই তোমাদের রক্ষা করবেন।

মিথ্যা হয়নি ভবিষ্যৎবাণী। রাজা মাইনসের রাজসভায় যখন চতুর্দশ তরুণ তরুণী উপস্থিত হলেন তখন থেসিউসের রূপ দেখে মুহূর্তে মোহিত হোলো জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী আরিয়াড্‌নি।

রাজা মাইনসের এক অতি ভয়ঙ্কর সন্তান ছিল। বিরাট দৈত্যের মতো চেহারা, দেহের নিম্নভাগটা মানুষের কিন্তু কোমর থেকে উপরটা ষণ্ডের। রক্তবর্ণ বিঘূর্ণিত চোখ, সর্বদা লালা-ঝরা প্রকাণ্ড মুখবিবর, মাথায় খড়্গের মতো দুই শিং। পৈশাচিক হিংস্রতা আর ষণ্ডের ক্রোধ—এই দুইয়ের সংমিশ্রণ ছিল এই প্রচণ্ড ষণ্ডমানবের চরিত্রে, দেহে ছিল দৈত্যের শক্তি। জীবন্ত প্রাণীর ঘাড় মটকে উত্তপ্ত রক্ত পান করে তৃষ্ণা মেটাত এই দানব, ক্ষুধা নিবৃত্তি করত কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। নররক্ত আর নরমাংস ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়।

এথেন্সের বিখ্যাত স্থপতি ডেডালাসকে আমন্ত্রণ করে ক্রীটদেশে নিয়ে এলেন মাইনস। স্থাপত্যবিদ্যায় স্বয়ং মিনার্ভাদেবীর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন ডেডালাস। মাইনসের নির্দেশে নসাস নগরীর অদূরে এক বিরাট উন্মুক্ত স্থানে ডেডালাস এক মহাশ্চর্য গোলকধাঁধা নির্মাণ করলেন। এই গোলকধাঁধার একটি প্রবেশপথ। তারপর অসংখ্য অলিগলি আর মোড়। অসংখ্য সিঁড়ি আর অসংখ্য প্রকোষ্ঠ। একবার এই গোলকাধাঁধায় যে প্রবেশ করে কিছুতে আর সে বার হতে পারে না। পথের পর পথ আর বাঁকের পর বাঁক তাকে টেনে নিয়ে চলে গোলকধাঁধার

ঠিক কেন্দ্রস্থলে।

সেই কেন্দ্রস্থলে মাইনস তাঁর ষণ্ডমানব সন্তান মিনোটরকে বন্দী করে রেখেছেন। প্রতিদিন বাছা বাছা বন্দীকে গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, বন্দীরা ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রস্থলে মিনোটরের মুখে গিয়ে পড়ে।

থেসিউসের নেতৃত্বে এথেন্সের যেসব তরুণ তরুণী ক্রীটে এসেছে তাদেরও ভাগ্যে আছে মৃত্যু—ঐ গোলকধাঁধার মধ্যে মাংসভুক ঐ মিনোটরের হাতে।

রাজা মাইনসের রাজপুরী অনির্বচনীয় ঐশ্বর্যের প্রতীক। বিরাট রাজসভা, মণিমাণিক্যখচিত তার ছাদ, স্ফটিক-নির্মিত স্তম্ভের সারি, রক্তবর্ণ হর্ম্যতল। স্বর্ণসিংহাসনে রাজা মাইনস বহুমূল্য রাজবেশে সজ্জিত হয়ে উপবিষ্ট। দুধারে পাত্রমিত্র অমাত্যদল। রাজ-সিংহাসনের পাশেই একটি মূল্যবান কিংখাব-মোড়া বেদী,—তাতে রাজার দুই অপূর্ব সুন্দরী কন্যা উপবিষ্টা,—আরিয়াড্‌নি ও ফিড্রা।

গ্রীক তরুণ তরুণীদের মধ্যে বীর থেসিউস সহজেই সভাস্থ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

থেসিউস আত্মপরিচয় দিতে রাজা মাইনস প্রশ্ন করলেন,—তুমি রাজপুত্র,—এথেন্সের ভবিষ্যৎ রাজা। তুমি কেন এই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আত্মবলি দিতে এসেছ ?

থেসিউস উত্তর দিলেন,—আমি এসেছি মিনোটরকে হত্যা করতে। তাকে হত্যা না করতে পারলে আপনার সন্ধির দাসত্ব থেকে আমার দেশবাসীর মুক্তি নেই। সেই পরাধীন দেশবাসীর রাজা হবারও কোনো গৌরব নেই।

মাইনস শুধোলেন,—ভাগ্যপরীক্ষার ফলেই কি তোমাকে আসতে হয়েছে ?

থেসিউস বললেন,—না রাজা, স্বেচ্ছায় এসেছি আমি।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তরুণ বীর রাজকুমার থেসিউসের দিকে তাকিয়ে ছিল ক্রীট রাজকুমারী,—সে দৃষ্টিতে বিস্ময় আর আকর্ষণের অপূর্ব প্রকাশ, অন্তর তার স্পন্দিত হচ্ছে সম্ভ্রম আর অনুরাগের অপূর্ব সংমিশ্রণে।

সভা ভঙ্গ হোলো। গ্রীক যুবক যুবতীদের বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেল রাজপ্রতিহারী। অন্তঃপুরের পথে যেতে যেতে আপন মনে আরিয়াড্নি বলতে লাগল,—না না, এ হতে পারে না! এ আমি হতে দেব না কিছুতে!

কী হতে পারে না? হতে পারে না থেসিউসের মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী! কে তাঁকে রক্ষা করবে? রক্ষা করবেন দেবী ভিনাস।

রাত্রির নিভৃতে রাজকুমারী আরিয়াড্নি থেসিউসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। বললে,—পালাও কুমার! আমি প্রতিহারীদের উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করেছি। তারা পথ ছেড়ে দেবে। সঙ্গীদের নিয়ে জাহাজে গিয়ে ওঠো। পরিত্যাগ করো এই সর্বনাশা দেশ!

কালো ওড়নায় রাজকুমারীর বরতনু আবৃত। শুধু চোখে পড়ে দেহাচ্ছাদনের নিচে কম্প্রবক্ষের কী উদ্বেগ, শুধু চোখে পড়ে কালো আঁখির প্রেমদৃষ্টিতে কী শঙ্কাভীরু গভীরতা!

একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন থেসিউস। তারপর বললেন,—তা হয় না রাজকুমারী, ঐ মিনোটরের মুখোমুখি আমাকে হতেই হবে। তাকে বধ করতেই হবে আমাকে।

তা তুমি পারবে আমি জানি কুমার, কিন্তু তারপর ঐ গোলক-ধাঁধা থেকে বার হয়ে আসবে কী করে? মিনোটরের আবাস থেকে পথ চিনে ফিরে আসা যে দেবতাদেরও অসাধ্য!

তা আমি জানিনে। তবু আমাকে যেতেই হবে। তবে আমি

একলা যাব,—সাথীদের সঙ্গে নেব না প্রথমে।

আরিয়াড্‌নি দুহাতে ধরলে থেসিউসের দক্ষিণ হাত। সময় নেই লজ্জার, দ্বিধার। সময় নেই আত্মছলনার। বললে সে,—কাল সন্ধ্যায় ওরা তোমাকে গোলকধাঁধায় নিয়ে যাবে। সেই বিভীষিকার অন্ধকার থেকে তোমাকে আমি বার করে আনব কুমার! কিন্তু কথা দাও আমাকে তুমি নেবে, আমাকে তুমি নিয়ে যাবে তোমার দেশে, তোমার জীবনের আশ্রয়-ছায়ায়?

কথা দিলাম। তুমি আমার হবে, আমি তোমাকে আমার জীবনে বরণ করে নেব চিরজীবনের জন্যে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গোলকধাঁধার সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলেন থেসিউস। সঙ্গে রাজকুমারী আরিয়াড্‌নি। গোলকধাঁধার দ্বারে এসে থেসিউস তাঁর তরবারিটি আরিয়াড্‌নির হাতে দিলেন। বললেন,—মিনোটরের দেখা যদি পাই, তাহলে তার সঙ্গে শুধু-হাতেই লড়ব। অস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করব না আমি।

আরিয়াড্‌নি থেসিউসের হাতে দিল মন্ত্রঃপূত সুতার একটি বল। এই সুতাও ডেডালাসের তৈরি, এ সুতা কখনো ছেঁড়ে না। সুতার একটি মুখ গোলকধাঁধার দ্বারে বেঁধে সুতার গুটিটি খুলতে খুলতে গোলকধাঁধার অভ্যন্তরে এগিয়ে চললেন থেসিউস। কতো পথ পার হলেন, কত মোড়, কতো বাঁক। ঘুরছেন তো ঘুরছেনই,—ঘুরছেন দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে, ঘুরছে মাথা। কেবল সুতাটি ধরে আছেন, সুতার গুটিটি খুলতে খুলতে চলেছেন,—কেননা এই সুতার সূত্র ধরেই আবার ফিরে আসা সম্ভব।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন গোলকধাঁধার কেন্দ্রস্থলে। সেখানে অপেক্ষা করছে মিনোটর।

বিভীষিকার হোলো অবসান। মোচিত হোলো ক্রীটরাজ মাইনসের কাছে এথেন্সবাসীর দাসত্বের গ্লানি। থেসিউসের বাহুবলে নিহত হোলো মিনোটর।

সূত্র ধরে ধরে পথ চিনে গোলকধাঁধা থেকে বার হয়ে এলেন থেসিউস। শঙ্কিতনেত্রা সুন্দরী আরিয়াড্‌নি দু-বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাঁর রক্তাক্ত ক্লান্ত দেহ।

সেই রাত্রেই অতি সঙ্গোপনে থেসিউস ও তাঁর সাথীবৃন্দ ক্রীট দ্বীপ পরিত্যাগ করলেন। জাহাজ ভাসল ভূমধ্যসাগরে। সঙ্গে ক্রীট রাজকুমারীদ্বয়। আরিয়াড্‌নি কনিষ্ঠা ভগ্নী ফিড্রাকেও সঙ্গে নিল।

প্রেমদেবী ভিনাসের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হোলো থেসিউসের ক্রীট পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে। তাই সফল হোলো না থেসিউসের সঙ্গে আরিয়াড্‌নির মিলন। এথেন্সের পথে থেসিউসের জাহাজ ন্যাক্সস দ্বীপে নোঙর ফেলল। সেখানে থেসিউসের মনে নামল এক আশ্চর্য বিস্মৃতি। অনেক কিছুই তিনি ভুলে গেলেন। ভুললেন আরিয়াড্‌নিকে। ঘুমন্ত রাজকুমারীকে ন্যাক্সস দ্বীপে পরিত্যাগ করে তিনি রাত্রের অন্ধকারে নোঙর তুলে জাহাজ ছেড়ে দিলেন।

ভুললেন তিনি জাহাজে শাদা পাল লাগানোর কথা। দিনের পর দিন বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন রাজা ঈজিউস। তিনি যখন দেখলেন যে যথারীতি কালো পাল তুলে জাহাজ ফিরে আসছে, তখন মৃত্যুপম শোক তাঁকে আচ্ছন্ন করল। থেসিউস, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র থেসিউস আর নেই, গেছে মিনোটরের পেটে,—তাই ফিরে আসছে কৃষ্ণপক্ষ তরণী। শোকে মুহ্যমান হয়ে আত্মহত্যা করলেন ঈজিউস।

এথেন্সের শূন্য সিংহাসনে থেসিউস উপবেশন করলেন। নিঃসঙ্গ ন্যাক্সস দ্বীপে প্রিয়পরিত্যক্তা আরিয়াড্‌নির ক্রন্দনে আকৃষ্ট হলেন

দ্রাক্ষাদেব ডায়োনিসাস। তিনি ভোলালেন আরিয়াড্নির দুঃখ, তিনি তাকে গ্রহণ করলেন প্রিয়সঙ্গিনী রূপে।

চার

যেমন বীর তেমনি প্রজাবৎসল ও ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ছিলেন থেসিউস। রাজা হবার কয়েক মাসের মধ্যেই থেসিউস এক দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন ও সমস্ত জ্ঞাতিশত্রুকে পরাস্ত করে সমস্ত অ্যাটিকা রাজ্যকে একটিমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁর ধারণা অত্যন্ত প্রগতিবাদী ছিল। প্রজার সুখ ও প্রজার স্বাধীনতা—এই দুইয়েরই প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল, এথেন্সের অধিবাসীদের রাজ্যশাসনের দায়িত্ববোধের ও আত্মবিকাশের নব নব প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বিরল বন্ধুপ্রীতির অধিকারী ছিলের থেসিউস।

বীর হারকিউলিস ছিলেন থেসিউসের আদর্শ। সদ্যোন্মাদ হারকিউলিসকে তিনি আত্মহত্যার পথ থেকে নিবৃত্ত করে এথেন্সে আশ্রয় দিয়েছিলেন। হারকিউলিসের সঙ্গে সুদূর অ্যামাজনদের রাজ্যে তিনি গিয়েছিলেন ও অ্যামাজন রানী অ্যান্টিয়োপিকে বন্দী করে এনেছিলেন।

অ্যামাজন নারীবাহিনী প্রতিশোধের অপেক্ষায় ছিল। এবার তারা সদলবলে এথেন্স আক্রমণ করল। মূল অ্যাটিকা রাজ্যে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর অনুপ্রবেশ এই প্রথম। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর থেসিউস অ্যামাজনদের পরাজিত করলেন। আসন্ন বিপদ থেকে এথেন্স মুক্তি পেল। অ্যান্টিয়োপিকে থেসিউস বিবাহ করেন,—কিন্তু আবার তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেও বাধ্য হন। অ্যান্টিয়োপির গর্ভে থেসিউসের একটি পুত্র হয়। তার নাম হিপোলিটাস।

অ্যামাজন আক্রমণের বিপদ কাটতে না কাটতেই এথেন্সের উপর এক নূতন বিপদ ঘনিয়ে এল। ল্যাপিথ-রাজ পিরিথৌস সসৈন্যে এথেন্স আক্রমণ করলেন। অ্যাটিকার উত্তরে পিনিউস নদীর মোহানায় ল্যাপিথ রাজ্য। মহাপরাক্রমশালী রাজা পিরিথৌস এথেন্সরাজ থেসিউসের বীরখ্যাতি শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন,—একবার চাক্ষুষ দেখে আসা যাক লোকটা কতো বড়ো!

বিরাট সৈন্যদল নিয়ে পিরিথৌস এথেন্স আক্রমণ করলেন। ম্যারাথন প্রান্তরে ল্যাপিথ বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ালো এথেন্সের প্রতিরক্ষাবাহিনী। ল্যাপিথদের পরিচালনা করছেন পিরিথৌস, আর প্রতিরক্ষাবাহিনীর নেতা থেসিউস নিজে। রণদামামা বাজছে, এখনই তুই দল মরণ-আহবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেই মুহূর্তে পিরিথৌস থেসিউসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

বললেন,—তুমি থেসিউস? এথেন্সের রাজা?

হ্যাঁ।

তোমাকেই খুঁজছিলাম।

আর তুমি?

আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার নাম পিরিথৌস।

থেসিউস বললেন,—তাহলে সাধারণ মানুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রয়োজন কী? এস, তোমাতে আমাতে শক্তিপরীক্ষা হোক।

থেসিউসের বীরকান্তির দিকে বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন পিরিথৌস। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন,—বেশ, তাই হোক। আমি প্রস্তুত।

হুঙ্কার দিয়ে পিরিথৌসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন থেসিউস। পিরিথৌস তুহাতে থেসিউসকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। সে আলিঙ্গন খোলা দায়!

বললেন,—আরে, ছটফট কোরো না। তোমাকে দেখতে এসেছিলাম, এবার বন্ধুত্বের বাঁধনে বেঁধেছি। ভুল কোরো না, এ বাঁধন মল্লযুদ্ধের বাঁধন নয়।

থেসিউস তো অবাক!

আজীবনের প্রীতি বন্ধনে বাঁধা পড়লেন থেসিউস আর পিরিথৌস।

প্রজারঞ্জক থেসিউসের চরিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ ছিল বন্ধু-বাৎসল্য। পিরিথৌসের বন্ধুত্বের প্রতিদান দিতে তাঁর দেরি হোলো না। পিরিথৌসের বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত হলেন থেসিউস। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অশ্বমানব সেণ্টরের দল এসেছিল বিবাহ-উৎসবে। সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে অশ্বমানবরা অসংযত ব্যবহার শুরু করে দিল। একজন তো নববধূকে অপমানই করে বসল। থেসিউস তরবারির এক আঘাতে উচ্ছৃঙ্খল সেণ্টরটার মাথা কাটলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হোলো পিরিথৌসের ল্যাপিথ প্রজা আর সেণ্টরদের মধ্যে মহা লড়াই। সেই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়লেন বন্ধু থেসিউস। কতো সেণ্টর যে তিনি বধ করলেন তার ঠিক নেই। শেষ পর্যন্ত সেণ্টররা দেশ ছেড়ে পালালো। দুঃখের বিষয় পিরিথৌসের নববধূও এই যুদ্ধের তাণ্ডবে প্রাণ হারালো।

পিরিথৌস মতলব করলেন যে তিনি প্রেতরাজ্যে যাবেন, সেখান থেকে প্লুটোর পত্নী প্রসের্পিনকে হরণ করে এনে তাঁকে বিয়ে করবেন। থেসিউসকে তিনি এই উদ্দেশ্যের কথা জানালেন, বললেন,—বন্ধু. এই অভিযানে তুমি আমায় সাহায্য করো।

দুঃসাহসিক অভিযানে থেসিউসের আগ্রহ অপরিসীম। তার উপর বন্ধুকে সাহায্য করতে হবে। দ্বিরুক্তি না করে থেসিউস

বললেন,—আলবৎ, কিন্তু তার আগে আমি এক রাজকন্যাকে পছন্দ করেছি আমার জন্যে। তাকে হরণ কবতে তুমি সাহায্য করো আমাকে।

কে সে কন্যা?

স্পার্টার রাজা টিণ্ডেরাসের কন্যা হেলেন। শুনেছি নাকি দেব-ঔরসে তার জন্ম, প্রকৃত পিতা তার স্বয়ং জুপিটার।

কিন্তু সে কন্যা যে নিতান্ত বালিকা হে!

তাতে কী! বড়ো তো হবে একদিন। যৌবনে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হবে হেলেন। এখনই তাকে হস্তগত করে রাখতে চাই।

পিরিথৌস বললেন,—বহুৎ আচ্ছা!

দুই বন্ধুর এই চক্রান্তের কথা কেউ জানল না। গোপনে তাঁরা স্পার্টায় যাত্রা করলেন।

স্পার্টার বালিকা রাজকুমাবী হেলেন ডায়ানা দেবীর মন্দিরে পূজা দিতে গেছে। সঙ্গে তার সখীবৃন্দ ও কয়েকজন রাজ-প্রতিহারী। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন থেসিউস আর পিরিথৌস। সখীরা পালালো, প্রতিহারীরা প্রাণ হারালো। হেলেনকে সবলে হরণ করে নিয়ে এলেন এথেন্সে। রাজপুরীতে বন্দিনী করে রাখলেন বালিকাকে।

বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এথেন্সে এসে উপস্থিত হলেন হেলেনের দুই ভাই,—স্পার্টার দুই বীর রাজপুত্র ক্যাস্টর আর পোলাক্স। থেসিউসকে তাঁরা বললেন,—অন্যায় মহাযুদ্ধে দেশে সর্বনাশ ডেকে এনো না থেসিউস। প্রত্যর্পণ করো আমাদের ভগ্নীকে!

হঠাৎ-খেয়ালের বশে অন্যায় করেছেন এ কথা বুঝতে দেরি হোলো না থেসিউসের। বালিকা হরণ, এ যে অতি নিকৃষ্ট কাজ! ক্ষমা চাইলেন তিনি, হেলেনকে মুক্তি দিলেন সমাদরে।

কিন্তু বন্ধু পিরিথৌসের ঋণ শোধ করতে হবে,—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে

তিনি। বন্ধুর জন্যে প্রেতপুরী থেকে রানী প্রসের্পিনকে যে নিয়ে আসতে হবে। বাতুলের প্রলাপ হলেও চুক্তিভঙ্গ তিনি করবেন কেমন করে!

প্রেতপুরীতে অবতীর্ণ হলেন থেসিউস আর পিরিথৌস। সোজা-সুজি মৃত্যুদেব প্লুটোর কাছে গিয়ে জানালেন দাবি—আপনার রানীকে আমরা চাই।

কেন?

আমার বন্ধু পিরিথৌসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেব।

থেসিউসের এই উদ্ভট দাবি শুনে হাসলেন প্লুটোদেব। লজ্জায় আরক্তিম হোলো রানী প্রসের্পিনের গণ্ডদেশ।

এ তো এক আশ্চর্য কৌতুক! কৌতুকের প্রতিদানে আর-এক কৌতুক করলেন প্লুটো। বললেন,—বাঃ বাঃ, এ তো অতি চমৎকার প্রস্তাব, এতে আমার আপত্তি করার কী আছে? তবে একটু বিশ্রাম করে নাও, বোসো এই শিলাসনে। ইতিমধ্যে প্রসের্পিন প্রস্তুত হয়ে নিন তাঁর নূতন স্বামীগৃহে যাবার জন্যে।

বসলেন দু-বন্ধু পাশাপাশি। আর ওঠা হোলো না। আসন চুম্বক-আকর্ষণে কামড়ে ধরে রইল তাঁদের।

প্লুটো ক্রূর হাসি হেসে বললেন,—হ্যাঁ, এইবার আরাম করে বিশ্রাম করো চিরদিন।

বহুদিন পরে হারকিউলিস এসে প্রেতপুরীর এই আসন থেকে মুক্ত করেন থেসিউসকে। তাঁর হয়ে দেবী প্রসের্পিনের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে তাঁকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিরিথৌসের পাপ গভীরতর। তাঁর আর মুক্তি হোলো না।

পাঁচ

বীর হিসাবে সর্বদেশপূজ্য হয়েছিলেন থেসিউস। প্রজাবৎসল বিচক্ষণ রাজা রূপে অম্লান খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জীবন তাঁর সুখের হয়নি। ব্যর্থতার অন্ধকারে ঝরে পড়েছে তাঁর শেষ নিশ্বাস। জেসনকে অভিশাপ দিয়েছিল মিডিয়া, সেই অভিশাপে ধূসর হয়েছিল জেসনের ভবিষ্যৎ। হতভাগিনী মাইনস-নন্দিনী আরিয়াড্‌নি নিঃসঙ্গ ন্যাক্সস দ্বীপে পরিত্যক্তা হয়ে শুধু কেঁদেছিল,—সেই অশ্রুজলে বুঝি পিচ্ছিল হয়েছিল থেসিউসের ভাগ্য।

আরিয়াড্‌নির কনিষ্ঠা ভগ্নী ফিড্রাকে সঙ্গে করে এনেছিলেন থেসিউস,—রাজপুরীতে সম্মানের সঙ্গে প্রতিপালিত হচ্ছিল সে। প্রৌঢ় বয়সে ফিড্রাকে তিনি বিবাহ করলেন। এই বিবাহ হোলো কাল।

অ্যামাজন-রানীর গর্ভে তাঁর যে পুত্রসন্তান জন্মেছিল, সেই হিপোলিটাসকে তিনি ট্রোয়েজেন রাজ্যে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে বাল্য কৈশোর অতিক্রম করে এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবকে পরিণত হয়েছিল হিপোলিটাস। বৃদ্ধ রাজা থেসিউস তাকে ট্রোয়েজেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

হিপোলিটাস ছিল দেবী ডায়ানার উপাসক। সমুজ্জ্বল তার স্বাস্থ্য, দেহে তার অমিত শক্তি। শক্তিপরীক্ষায় সে ছিল শ্রেষ্ঠ, আরণ্য শ্বাপদের শিকার-নৈপুণ্যে সে ছিল অদ্বিতীয়। চিরকুমারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল সে,—সযত্নে পরিহার করে চলত দেবী ভিনাসের দৃষ্টি। ঈর্ষিতা ভিনাস মনে মনে স্থির করলেন,—কঠোর শাস্তি দিতে হবে এই দুর্বিনীত হিপোলিটাসকে।

নবপরিণীতা ফিড্রাকে নিয়ে থেসিউস এলেন ট্রোয়েজেনে। বহু-দিন পরে তরুণ পুত্র হিপোলিটাসকে পেয়ে তিনি পরম খুশি,—পরিতৃপ্ত তাঁর পিতৃহৃদয়। কিন্তু ভিনাসের চক্রান্তে হিপোলিটাসকে দেখে পাগল হোলো ফিড্রা।

হিপোলিটাসের বিমাতা ফিড্রা,—হিপোলিটাস তার পুত্রসম। তার প্রতি এই আকর্ষণ বড়ো লজ্জার, বড়ো নিন্দার। কিন্তু দুর্বার আকর্ষণ, তাকে দমন করা দুঃসাধ্য। হিপোলিটাসের প্রতি এই অবাঞ্ছিত আকর্ষণে বাঘিনীর মতো নৃশংসা হয়ে উঠল ফিড্রা। একদিন নিভৃতে সে হিপোলিটাসকে এক পত্র পাঠালো। সেই পত্রে সে উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রকাশ করল তার নিভৃত মনের কামনা। লিখল,—বিশ্বাসঘাতক আমার স্বামী, বিশ্বাসঘাতক তোমার পিতা। কেন তার কথা তুমি আমি শুনব? আমার ভগ্নীকে সে নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করেছে, তোমার মাকে সে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে,—তার প্রতি কিসের দরদ? তোমাকে আমি চাই, তুমি আমার হও!

চিঠি পেয়ে রাগে আগুন হয়ে উঠল হিপোলিটাস। ছুটে গেল সে বিমাতার কাছে। বললে,—বিশ্বাসঘাতিনী! মাতৃসমা হয়ে এ কী ঘৃণ্য প্রস্তাব তুমি করেছ! জানো না কার তুমি স্ত্রী, কার আমি পুত্র? জানো না, আমাদের জীবনের সর্বগৌরবের আকর যিনি, তিনি বিশ্বপূজ্য থেসিউস! ছি, ছি, ছি!

রাজপুরী থেকে অপসৃত হোলো হিপোলিটাস।

পাংশু মুখে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল ফিড্রা। তারপর একাকী আপন কক্ষে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দিল সে।

রাজপুরীতে যখন থেসিউস ফিরে এলেন তখন অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল উঠেছে। আপন যৌবনস্ফুরিত বক্ষে নিজ হাতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা

বসিয়ে আত্মহত্যা করেছে রানী ফিড্রা,—মৃত্যুর পূর্বে স্বামীর জন্যে রেখে গেছে শেষ পত্র।

শোকমন্থর কম্পিত হাতে ফিড্রার পত্র পড়লেন থেসিউস। তারপর হাঁক দিলেন,—কোথায় হিপোলিটাস? ডাকো তাকে,—ধরে আনো, বেঁধে আনো তাকে।

বিমাতার আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে নিজেই ছুটে আসছিল হিপোলিটাস। থেসিউস তার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন,—ব্যস, আর এগিয়ো না। একটি কথা বলবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। দূর হও তুমি আমার সামনে থেকে। পিতা হয়ে অভিশাপ দিচ্ছি, ধ্বংস হও তুমি!

কেন এ অভিশাপ, পিতা? কী করেছি আমি!

কী করেছ তুমি! তা লেখা আছে তোমার মাতার এই শেষ চিঠিতে।

সর্বসমক্ষে চীৎকার করে থেসিউস পাঠ করলেন আত্মঘাতিনী ফিড্রার শেষ চিঠি। চিঠিতে সে লিখে গেছে,—স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অসৎ হিপোলিটাস লালসাপঙ্কিল হাতে স্পর্শ করেছে তার দেহ,—তাই এই দেহ সে আর রাখল না।

বিস্মিত বিমূঢ় হিপোলিটাসের মুখে সহজে কথা ফুটতে চায় না। ধীরে ধীরে স্খলিত কণ্ঠে সে বললে,—পিতা, এ অভিযোগ মিথ্যা। দেবরাজ জুপিটারের নামে আমি শপথ করছি, আমি নিষ্পাপ।

মৃত্যু দিয়ে সে প্রমাণ করে গেছে যে এ কথা সত্য! জুপিটারের নাম তুমি মুখে এনো না! জুপিটারের বজ্র ভেঙে পড়ুক তোমার মাথায়! দূর হও রাজ্য থেকে!

বিদায় নিল হিপোলিটাস। কিন্তু নির্বাসনে নয়, আসন্ন মৃত্যু অপেক্ষা করছিল তারও জন্যে। সমুদ্রের তীরের পথ বেয়ে সে

চিরদিনের মতো পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে চলেছিল রথে চড়ে। হঠাৎ যেন পিতৃ-অভিশাপ পূরণের জন্যেই সমুদ্র থেকে বিরাট একটা দৈত্য উঠে এল। রথের ঘোড়ারা ভয় পেয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। উল্টে গেল রথ, ভেঙে গেল রথের চাকা। মাথায় মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে সমুদ্রতীরে পড়ে রইল মূর্ছিত হিপোলিটাস।

দেবী ডায়ানা ছুটে এলেন থেসিউসের কাছে। দেবীর মুখ থেকে সত্য প্রকাশিত হোলো। থেসিউসকে নিয়ে দেবী গেলেন সমুদ্রতীরে, যেখানে বালুকা-শয্যায় শুয়ে রক্তললাট হিপোলিটাস মৃত্যুর পদধ্বনির অপেক্ষা করছে। পশ্চিম আকাশ গোধুলির রঙে রাঙা।

থেসিউস জড়িয়ে ধরলেন পুত্রের অর্ধচেতন দেহ,—হিপোলিটাস, হিপোলিটাস, ক্ষমা কর্ আমাকে!

হিপোলিটাস বললে,—ক্ষোভ কোরো না পিতা, তোমার কোনো দোষ নেই। দোষ আমার ভাগ্যের,—আর দোষ অলিম্পাসের।

দেবী ডায়ানার নিষ্পাপ মুখের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে চিরদিনের জন্যে চোখ বুজল হিপোলিটাস। ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকার।

ছয়

আদর্শ দেশনেতা ছিলেন থেসিউস। ঐতিহাসিক যুগে গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শীর্ষস্থান গ্রহণ করেছিল এথেন্স। এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে ছিল থেসিউসের অবদান। গণতন্ত্রের আবিষ্কর্তা রূপে বিশ্বমানবের ইতিহাসে চিরদিন সম্মানিত হবে এথেন্স। এই গণতন্ত্র থেসিউসের সার্থক স্বপ্ন। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন থেসিউস,—শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নয়, মানবাত্মার স্বাধীনতা।

মিনোটরকে বধ করে তিনি স্বদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। খণ্ডবিখণ্ড সামন্ত-তন্ত্রকে জয় করে তিনি সমস্ত অ্যাটিকা রাজ্যকে একছত্র শাসনের অধিকারে আনেন। দেশবাসীর মধ্যে তিনি স্বাধিকারবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করেন। নিজের রাজক্ষমতাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন প্রজাসাধারণের শুভ কামনার ভিত্তির উপর। বহিঃশত্রুকে তিনি বারে বারে প্রতিহত করেন, কিন্তু পররাজ্যহরণের মানসে তিনি কখনো তাঁর শক্তিকে উদ্যত করেন নি।

থীবসের রাজা ঈডিপাসের ভাগ্যে ছিল সর্বনাশা রেখা, ভয়ঙ্কর অভিশাপ। ঈডিপাস যখন শিশু, তখন ভবিষ্যৎবাণী হয় যে এই পুত্র তার পিতাকে হত্যা করবে। ঈডিপাসের পিতা রাজা লেয়াস শিশুকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাবার নয়—ঈডিপাস অজ্ঞাতসারে আপন পিতাকে হত্যা করেন। থীবসের সিংহাসন তিনি অধিকার করেন আপন গৌরবে। তিনি জানতেন না তিনি লেয়াসের পুত্র, তিনি জানতেন না তাঁর হাতেই পিতা লেয়াস নিহত হয়েছেন। আরো সর্বনাশের কথা, থীবসের রাজা হবার পর লেয়াসের বিধবা পত্নী আপন জননী জোকাস্টাকে তিনি বিবাহ করেন। তিনি জানতেন না জোকাস্টা তাঁর জননী।

এই রহস্য যখন প্রকাশ পেল তখন মাতা জোকাস্টার গর্ভে তাঁর সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছে। আত্মহত্যা করলেন জোকাস্টা। আপন হাতে নিজের দু-চোখ অন্ধ করে ঈডিপাস রাজ্য পরিত্যাগ করে বার হলেন নিরুদ্দেশের পথে।

অন্ধ ঈডিপাসের পাপ অকল্পনীয়। তাঁকে দেখে ঘৃণায় ভয়ে শিউরে ওঠে পৃথিবীর মানুষ আর অলিম্পাসের দেবতা। অন্ধ পথিক ঈডিপাস,—মনুষ্যসমাজে অপাংক্তেয় ঈডিপাস, ভাগ্যহত জীবন্ত প্রেত ঈডিপাস। কে তাঁকে আশ্রয় দেবে? তৃষ্ণার্ত বৃদ্ধ পথিকের

'মুখে কে দেবে একবিন্দু পানীয়,—অন্ধ চোখের নিত্য-অশ্রুধারায় করুণার বিন্দুমাত্র বাষ্প ঘনাবে কার অন্তরে ?

কতো পথ আর কতো প্রান্তর হেঁটে হেঁটে শেষ পর্যন্ত এথেন্স রাজ্যের প্রান্তসীমায় এসে পৌছলেন ঈডিপাস। ঘনিয়ে আসছে দিনান্তের অন্ধকার। আসন্ন প্রদোষের ক্লান্ত ব্যর্থ ধূসরতার প্রতিমূর্তি যেন তিনি,—হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এথেন্সরাজ থেসিউস।

দাঁড়ান রাজা ঈডিপাস। শেষ হোক আপনার নিরুদ্দেশ পথযাত্রা।

কে? কে তুমি? মানুষের কণ্ঠস্বরে কেউ তো আমাকে বহু দিন ডাকে নি!

আমি থেসিউস।

থেসিউস? এথেন্সের রাজা থেসিউস? কী চাও তুমি আমার কাছে থেসিউস?

আপনাকেই আমি চাই রাজা। সম্মানিত অতিথি রূপে আপনাকে আমি বরণ করতে চাই আমার রাজ্যে।

বলো কী? আমি যে সমাজ-তাড়িত অভিশপ্ত! আমি যে মহাপাপী! আমাকে আশ্রয় দেবে তুমি?

হ্যাঁ ঈডিপাস। কে বলে আপনি পাপী? জ্ঞাতসারে আপনি কোনো পাপ করেন নি, কোনো অপরাধ করেন নি দেবতা ও সমাজের কাছে। আপনার ভাগ্য অলিম্পাসের ক্রূর পরিহাস।

অন্ধ রাজা ঈডিপাসকে হাতে ধরে স্বরাজ্যে নিয়ে এলেন থেসিউস। প্রজাদের তিনি বললেন,—ভুল বুঝোনা তোমরা। দৈবকে ভয় কোরো না, দুর্গতকে রক্ষা করো। অবিচল বুদ্ধিতে মানুষের বিপর্যস্ত মনুষ্যত্বকে সম্মান করো।

এথেন্সের পার্শ্ববর্তী কলোনাস নামক এক ক্ষুদ্র জনপদে ছায়াচ্ছন্ন এক শান্ত আশ্রমে ঈডিপাসকে স্থান দিলেন থেসিউস। শান্তি

পেলেন ঈডিপাস। ঈডিপাসের শেষ দিন যেদিন ঘনিয়ে এল, সেদিন তাঁর অন্ধ আঁখিতে আলো ফুটল। ওপারের প্রত্যুষ-আভা। থেসিউসকে তিনি ডাকলেন। স্খলিত কণ্ঠে বললেন,—তুমি অগতির গতি,—অশরণের শরণ। আমার শেষ আশীর্বাদ তুমি গ্রহণ করো।

সেই আশীর্বাদ মাথায় নিলেন থেসিউস।

ঈডিপাসের মৃত্যুর পর থীবস রাজ্যে আত্মঘাতী বিপদের কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঈডিপাসের দুই পুত্র সিংহাসনের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। এক ভাই ইটিয়োক্লেস সিংহাসন অধিকার করে অপর ভাই পলিনিসেসকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করলেন। জ্বলন্ত হিংসা বুকে নিয়ে পলিনিসেস আর্গসের রাজা অ্যাড্রাস্টাসের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

অ্যাড্রাস্টাস সাদরে অভ্যর্থনা করলেন পলিনিসেসকে,—আপন কন্যার বিবাহ দিলেন তাঁর সঙ্গে। তারপর জামাতার দাবি জানিয়ে দূত পাঠালেন থীবস রাজের কাছে।

দূতকে হাঁকিয়ে দিলেন ইটিয়োক্লেস। বললেন,—শৃগালের দাবি বরং সিংহ মানতে পারে, কিন্তু পলিনিসেসের দাবি আমি মানতে রাজি নই।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে থীবসের বিপক্ষে সাত জন বিখ্যাত বীর যোগদান করেন। সিথেরন পর্বতের সানুদেশে অভিযাত্রী বাহিনী এসে উপস্থিত হোলো। সপ্তরথী সপ্তবাহিনী নিয়ে থীবস রাজ্যের সাতটি দুর্গদ্বার আক্রমণ করলেন।

সে কী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! সপ্তরথীর মধ্যে ছজন নিহত হলেন। থীবসের সেনাপতিরাও প্রাণ হারালেন একে একে। যুদ্ধ চলতে লাগল নগরের পরিসীমার বাইরে পর্বত সানুদেশে। উভয় পক্ষের অগণিত সৈন্য হতাহত হোলো। রক্তরাঙা হয়ে উঠল সমস্ত প্রান্তর—

অস্ত্রের ঝনঝনি আর আহতের আর্তনাদে মুখর হোলো আকাশ। তবু যুদ্ধের শেষ নেই, তবু নেই জয় পরাজয়ের দিশা।

রণক্ষেত্রের মহাশ্মশানে শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুই ভাই,—ইটিয়োক্লেস আর পলিনিসেস। ক্লান্ত সৈন্যদল স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল সেই প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের শেষ হোলো উভয়েরই জয়ে,—উভয়েরই, মৃত্যুতে। আর্গসের সপ্তরথীর মধ্যে শুধু জীবিত রইলেন রাজা অ্যাড্রাস্টাস আর থীবসের শূন্য সিংহাসনে উপবেশন করলেন ঈডিপাসের এক ভ্রাতা ক্রিয়ন।

সংগ্রামনিহত অসংখ্য থীবসবাসীর মৃতদেহের সৎকার হোলো ক্রিয়নের প্রথম কাজ। সেইসঙ্গে তিনি বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন,—স্বদেশের স্বাধীনতা লুণ্ঠন করতে যারা এসেছিল তাদের দেহ যেন কেউ স্পর্শ না করে,—শৃগালে শকুনে সেই শত্রুদের দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক।

রাজা ইটিয়োক্লেসের দেহ তিনি পরম সমাদরে সমাধিস্থ করলেন,—কিন্তু পলিনিসেসের নয়। স্বদেশদ্রোহী কুক্কুর ঐ পলিনিসেস,—একমুঠো মাটি যে ছড়াবে ওর দেহের উপর, তার শাস্তি মৃত্যু।

গভীর রাত্রে রাজপুরী থেকে বার হয়ে এল এক নারী। পায়ে পায়ে সন্তর্পণে নগর-পরিখা পার হয়ে এগিয়ে চলল যুদ্ধক্ষান্ত মহাশ্মশানে। এই নারী অ্যান্টিগন,—ইটিয়োক্লেস ও পলিনিসেসের ভগ্নী, ক্রিয়নের পুত্র হীমনের প্রণয়িনী।

দুই ভ্রাতাকে সমান ভালোবাসত অ্যান্টিগন, উভয় ভাইয়ের স্বার্থ-দ্বন্দ্বে সমান আশঙ্কায় বুক তার কেঁপেছিল,—উভয়ের মৃত্যুতে সমান শোক সে পেয়েছিল। এক ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে,—আর-এক ভাইয়ের রক্তমাখা ধূলিলুণ্ঠিত মৃতদেহ শৃগাল

শকুনের আহার্য হয়ে পড়ে রয়েছে উন্মুক্ত প্রান্তরে।

সেই রাত্রে পলিনিসেসের মৃতদেহ খুঁজে বার করল অ্যান্টিগন। নগর-পরিখার পাশে একটি কবর খুঁড়ে সেই কবরে মৃতদেহটি রাখল। কাজ সম্পূর্ণ হতে না হতে প্রত্যূষের আলো ফুটল পূর্বগগনে। সকলের অলক্ষিতে আবার রাজপুরীতে প্রবেশ করল অ্যান্টিগন।

সকালবেলা রাজা ক্রিয়নের কাছে সংবাদ পৌঁছল,—গতকাল রাত্রে কে বা কারা পলিনিসেসের দেহ সমাধিস্থ করার চেষ্টা করেছে।

পরদিন মধ্যরাত্রে ভ্রাতার সমাধি সম্পূর্ণ করে তার উপর ম্লান একটি প্রদীপ জ্বেলেছে শোকস্তব্ধা অ্যান্টিগন,—অঞ্চল থেকে কটি পুষ্প হাতে নিয়ে নীরবে গাঁথছে অশ্রুমালা, শান্তি প্রার্থনা করছে,—এমন সময় প্রহরীরা এসে তাকে ধরল, শৃঙ্খলে বেঁধে নিয়ে গেল কারাগারে।

পরদিন বিচার সভা।

পলিনিসেস ঘরশত্রু বিভীষণ। এত যুদ্ধ, এত মৃত্যু তার জন্যে। এত শোক, গৃহে গৃহে ক্রন্দনের এত রোল,—শুধু তারই জন্যে।

বন্দিনী অ্যান্টিগনের দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন রাজা ক্রিয়ন,—কেন মাটি দিয়েছ পলিনিসেসের দেহে,—কেন নির্দেশ লঙ্ঘন করেছ আমার?

শৃঙ্খলিত শোকমূর্তির নয়নে নেই অশ্রু, কণ্ঠে নেই দ্বিধার জড়তা। শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,—তোমার নির্দেশের চেয়েও বড়ো নির্দেশ আমি পালন করেছি রাজা। সে নির্দেশ দেবতার, সে—নির্দেশ মনুষ্যত্বের।

জানো এর শাস্তি কী?

জানি। ভয় করিনে।

ভূগর্ভস্থ এক প্রকোষ্ঠে অ্যান্টিগনকে বন্দী করলেন রাজা।

বললেন,—তোমারও সমাধি এই আমি রচনা করলাম। ক্ষুৎ-পিপাসায় এখানে তুমি তিলে তিলে মরো।

রাজ্যের লোক শিউরে উঠল ক্রিয়নের নিষ্ঠুর জিঘাংসায়। মিনতি করল আত্মীয়-পরিজন, মিনতি করল সভাসদগণ। পুত্র হীমন এসে বললে,—পিতা, অ্যান্টিগন বাকদত্তা বধূ আমার, মুক্তি দিন ওকে।

অবিচলিত রাজা ক্রিয়ন।

অন্ধ ভবিষ্যৎবক্তা টাইরেসিয়াস এসে বললেন,—তোমার নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। স্বর্গের অভিসম্পাত ঘনিয়ে এসেছে তোমার মাথার উপর। এখনো সাবধান হও!

অলিম্পাসের রোষদৃষ্টি কল্পনা করে শেষ পর্যন্ত ভয় পেলেন ক্রিয়ন। হাতে চাবি নিয়ে পায়ে পায়ে ভূগর্ভ-প্রকোষ্ঠে নেমে গেলেন। দ্বার খুলে দেখেন অ্যান্টিগন আর নেই। তিলে তিলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা না করে প্রকোষ্ঠের ছাদে এক দড়ি লাগিয়ে সেই দড়ি গলায় বেঁধে সে ঝুলেছে। সহজে মুক্তি পেয়েছে হতভাগিনী।

পিতার কটিদেশ থেকে তীক্ষ্ণ তরবারিটি ছিনিয়ে নিল হীমন। তারপর সেই তরবারি আমূল বসিয়ে দিল নিজের বুকে। পুত্রের আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে আপন নিভৃত প্রকোষ্ঠে বিষপাত্র ওষ্ঠে তুললেন তার মাতা,—রাজা ক্রিয়নের রানী।

ভাগ্যহত নির্বান্ধব আর্গসরাজ অ্যাড্রাস্টাস এথেন্সের শরণাপন্ন হলেন। তাঁর সঙ্গে এল আর্গসের একশত সদ্যস্বামীপুত্রহারা। থেসিউসকে সানুনয় প্রার্থনা জানালেন অ্যাড্রাস্টাস,—তুমি আমাদের সহায় হও। থীবসের যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বীর সন্তানদের মৃতদেহগুলি পড়ে আছে। সেগুলি শুধু আমরা সৎকার করতে চাই। আমাদের হয়ে তুমি ক্রিয়নকে অনুরোধ করো।

থেসিউস বললেন,—তোমাদের এই লড়াইয়ের মধ্যে আমি কে? আমার কথা শুনবেই বা কেন ক্রিয়ন?

শুনবে, নিশ্চয়ই শুনবে। মহাবীর তুমি, তোমাকে ভয় না করে সে যাবে কোথায়? দুর্গতের রক্ষাকর্তা তুমি,—এই রোরুদ্যমানা নারীদের অনুরোধ তুমি রক্ষা করো।

দেবী মিনার্ভার মন্ত্রসাধক থেসিউস,—স্বাধীনতার প্রিয় পূজারী তিনি। কঠোর ভর্ৎসনা ধ্বনিত হোলো তাঁর কণ্ঠে,—ঘরশত্রু বিভীষণের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে পররাজ্য হরণের অভিযানে যখন বার হয়েছিলে, তখন এই পরিণামের কথা মনে ছিল না?

আর্গসবাসিনীদের ক্রন্দনরোল রাজমাতা ঈথরার কানে পৌঁছে-ছিল। তিনি এসে দাঁড়ালেন দুই রাজার সামনে, শুনলেন তাঁদের কথাবার্তা।

এবার তিনি থেসিউসকে বললেন,—পুত্র, একটি কথা আমি বলতে পারি? এথেন্সের সম্মান আর তোমার সম্মান,—এই উভয় সম্মানের উপযুক্ত একটি প্রস্তাব আমি করতে পারি?

নিশ্চয়,—বললেন থেসিউস,—শোনাও মা তোমার প্রস্তাব!

ন্যায়নিষ্ঠ তুমি, সত্যের পূজারী তুমি। অ্যাড্রাস্টাসকে তুমি অন্যায় তিরস্কার করোনি। কিন্তু ন্যায়ের প্রত্যক্ষ সম্মান রক্ষাও তোমার কর্তব্য,—এই সম্মান রক্ষাতেই তোমার সম্মান, এথেন্সের সম্মান। মৃতদেহের সৎকার আর আত্মার তৃপ্তিবিধান সারা পৃথিবীর জীবিত মানবের কর্তব্য,—সারা পৃথিবীর সভ্যতার ভিত্তি। এই কর্তব্যে বাধা দিয়ে থীবস আজ সারা পৃথিবীর সভ্যতার মুখে কালিমা লেপে দিতে চায়। তার প্রতিবিধান তুমি ছাড়া করবে কে,—এথেন্স ছাড়া করবে কে?

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করলেন থেসিউস। তারপর ম্লান হেসে বললেন,—তুমি ঠিক বলেছ মা। কিন্তু এর পরিণামে মহা

বিসম্বাদ। আমার দেশবাসীকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমি দিয়েছি। আমার প্রজাসমিতির মত না নিয়ে আমি দেশকে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে ঠেলে দিতে পারিনে।

এথেন্সবাসীরা রাজমাতা ঈথরাকে সমর্থন করল। থীবসরাজ ক্রিয়নের কাছে থেসিউস আর্গসবাসীদের হয়ে অনুরোধ জানিয়ে তাঁর দূত পাঠালেন,—তিনি যেন দয়া করে আর্গসবাসীদের মৃতদেহ-গুলি সৎকারের জন্য রণক্ষেত্র থেকে কুড়িয়ে আনবার অনুমতি দেন।

উদ্ধত দম্ভের সঙ্গে দূতের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন থীবসরাজ।

তারপর যুদ্ধ। এথেন্সের সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে থীবস আক্রমণ করল। আর্গসের সপ্তরথীকে পরাভূত করেছিল থীবস, কিন্তু মহাবীর থেসিউসের অভিযান রোধ করতে পারল না। থীবস নগরীর পতন হোলো, রাজধানীর নিভৃত প্রকোষ্ঠে আত্ম-গোপন করে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন ক্রিয়ন। ক্রন্দনের রোল উঠল ঘরে ঘরে। এবার শুরু হবে নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা, শুরু হবে নির্দয় লুণ্ঠন।

থেসিউস নিবৃত্ত করলেন আপন সৈন্যবাহিনীকে। বললেন,—অস্ত্র সংবরণ করো তোমরা। থীবসের সাধারণ অধিবাসীর একজনেরও অঙ্গ স্পর্শ কোরো না। পররাজ্য জয় করতে আমরা আসিনি, পরের ধন হরণ করার প্রবৃত্তি আমাদের নয়।

আশ্বস্ত হোলো থীবসের জনগণ। এথেন্সের গৌরবে থেসিউসের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হোলো আকাশ।

যুদ্ধে পতিত সমস্ত মৃতদেহের যথাবিহিত সৎকার করলেন থেসিউস। জুপিটার মিনার্ভা ও প্লুটোর পূজা দিলেন তিনি থীবসের দগ্ধ রণক্ষেত্রে। পূজা দিলেন দেবী ডিমিটারের। প্রার্থনা

করলেন,—হে দেবী, নিষ্ঠুর ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের আহুতিতে অসংখ্য নির্দোষ মানুষের রুধিরধারায় নিষ্ফল হয়েছে থীবসের বিস্তীর্ণ উপত্যকা,—আবার তুমি করুণা করো, তোমার আশীর্বাদে সবুজের সমারোহে আবার আনন্দ-পুলকিত হোক এই দুর্ভাগা দেশ।

সাত

শেষ জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল থেসিউসের ভাগ্যাকাশে। বন্ধুহীন বিদেশে নিষ্করুণ বিশ্বাসঘাতকতায় অবসিত হয়েছিল তাঁর জীবন।

জেসনকে অভিসম্পাত দিয়েছিল মিডিয়া,—সেই অভিশাপে জেসনের জীবন শেষ হয়েছিল খ্যাতিবিহীন অন্ধকারে, হতাশার ধূসরতায়। আরিয়াড্‌নি কিন্তু অভিশাপ দেয়নি থেসিউসকে। নির্জন ন্যাক্সস দ্বীপে পরিত্যক্তা প্রণয়িনী শুধু কেঁদেছিল, শুধু অশ্রুজলে নিষিক্ত করেছিল বিচ্ছেদ-ব্যাকুল বিপন্ন হৃদয়।

প্লুটোদেবের প্রেতপুরীতে যখন বন্দী ছিলেন থেসিউস তখন তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে এক বিরুদ্ধচারী দল রাজ্যের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অন্তর্বিপ্লবের এই ভাঙনকে তিনি শেষ পর্যন্ত রোধ করতে পারেন নি। যদি তিনি দুর্মদ একনায়ক হতেন তাহলে পারতেন। অবশেষে এথেন্সের সিংহাসন তাঁকে পরিত্যাগ করতে হোলো,—সাময়িক স্বার্থের বশীভূত হয়ে প্রজারঞ্জক রাজাকে বর্জন করল প্রজারা।

স্বরাজ্য পরিত্যাগ করে থেসিউস ক্রীট দ্বীপের অভিমুখে সমুদ্র-যাত্রা করলেন। এই ক্রীট দ্বীপের মিনোটরকে বধ করে থেসিউসের বীর্যবান জীবনের সূচনা হয়েছিল,—ম্লান রজনীর ক্লান্ত প্রদীপে শেষ

আলোকোচ্ছ্বাসের আশায় আবার সেই ক্রীট দ্বীপেই ফিরে চললেন থেসিউস।

কিন্তু বিধি বাম। ঝড় উঠল সমুদ্রে। দিশা হারালো থেসিউসের জাহাজ। শেষ পর্যন্ত স্কাইরস দ্বীপে তিনি উত্তীর্ণ হলেন।

স্কাইরস দ্বীপের রাজা লাইকোমিডিস মুখের কথায় থেসিউসকে সমাদর করলেও মনে মনে হিংসা আর ভয়ে জ্বলতে লাগলেন। থেসিউস যে-সে লোক নন, অতি বিপদজনক অতিথি। কোনদিন তাঁর রাজ্যই বা গ্রাস করে বসেন!

থেসিউস অবশ্য স্কাইরস দ্বীপে নিভৃত বিশ্রামই চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক লাইকোমিডিস একদিন তাঁকে এক পর্বতে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে পর্বতচূড়া থেকে ঠেলে ফেলে দিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে নয়,—নিতান্ত নিরুপায় অপঘাতে প্রাণ হারালেন থেসিউস।

এথেন্সবাসীদের ভুল বুঝতে দেরি হয়নি। থেসিউসের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই দেখা গেল, যাঁকে তারা রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিল, পাঠিয়েছিল মৃত্যুর পথে,—তাঁর অমর আত্মা প্রতি এথেন্স-বাসীর হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। থেসিউসের নামে বিরাট এক স্মারক-মন্দির নির্মাণ করল তাঁর প্রজারা,—দেবতাজ্ঞানে তাঁর পূজা করতে লাগল এই মন্দিরে। ঘোষণা করল তারা,—এই মন্দির যতো ভাগ্যহত আর্ত দরিদ্রের আশ্রয়,—যারা ছিল থেসিউসের প্রিয়, যাদের রক্ষাকর্তা ছিলেন থেসিউস।

বহু শত বৎসর পরের কথা। এথেন্স নগরী তখন সাগর-সম্রাজ্ঞী রূপে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। পারস্য সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তি এথেন্সের নৌশক্তির কাছে পর্যুদস্ত। ঈজিয়ান সমুদ্রের এপার ওপার

জুড়ে এথেন্স এক বিরাট রাষ্ট্রীয় সংহতি গড়ে তুলেছে। এথেন্সে অপরাজেয় নৌবাহিনীর এক অধ্যক্ষ স্কাইরস দ্বীপে গমন করে সেখানকার জলদস্যুদের পরাস্ত করলেন। সেইসঙ্গে তিনি আবিষ্কার করলেন এক মহান সমাধি, যার অভ্যন্তরে তখনো রয়েছে থেসিউসের বিরাট দেহ-কঙ্কাল। থেসিউসের দেহাবশেষ রাজকীয় সমারোহের সঙ্গে এথেন্সে আনা হোলো। সমুদ্রপারের নির্বাসন থেকে মহাবীর থেসিউস আবার স্বদেশে ফিরে এলেন বহু শতাব্দী পরে। মাতৃভূমির শান্ত ক্রোড়ে রচিত হোলো তাঁর শান্তিশয্যা।